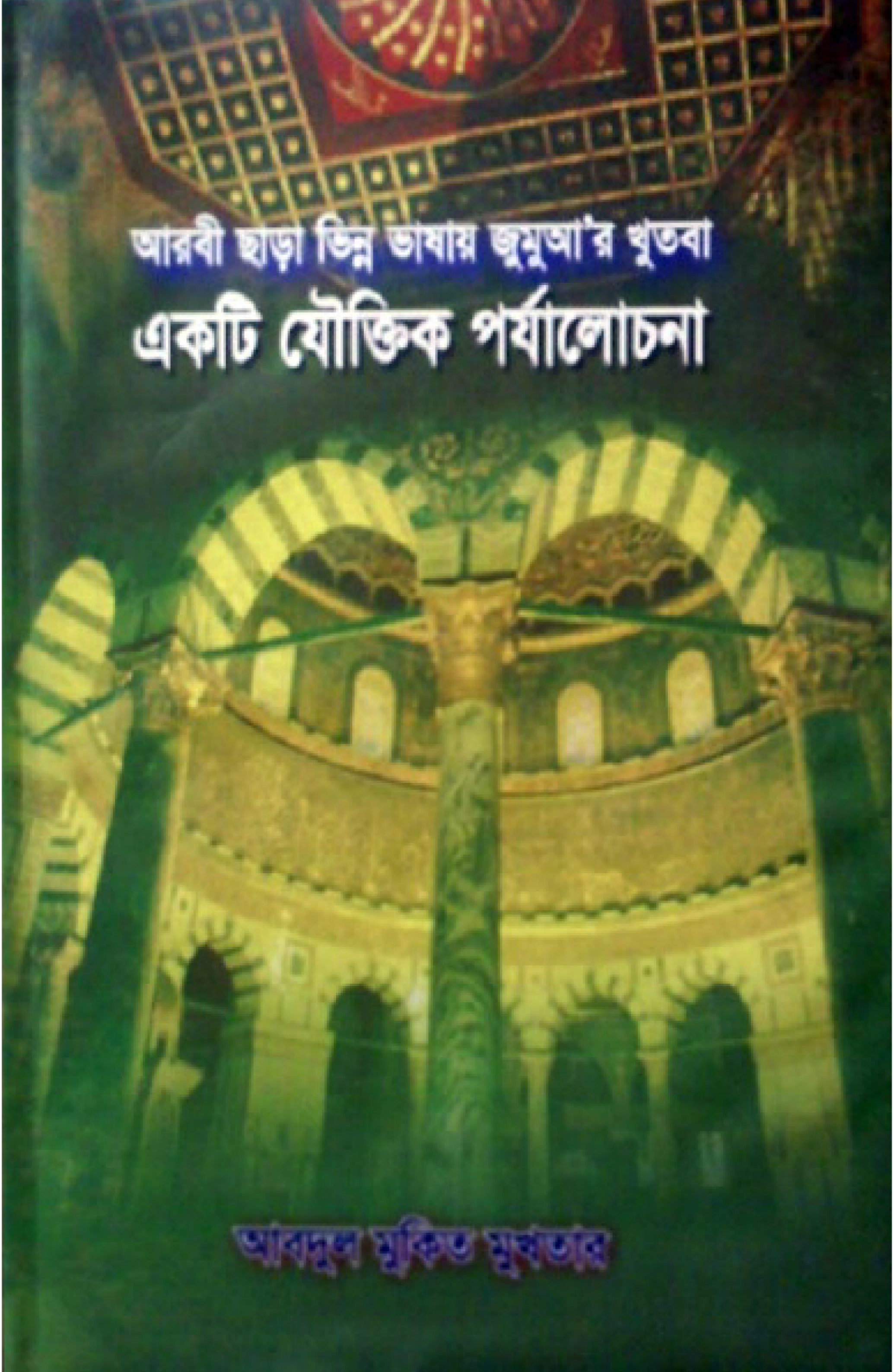


আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষায় জুমুআ'র খুতবা

একটি যৌক্তিক পর্যালোচনা

আবদুল মুকিত মুখতার

আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষায় জুমুআ’র খুতবা

একটি যৌক্তিক পর্যালোচনা

আবদুল মুকিত মুখতার

আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষায় জুমুআ'র খুতবা

একটি যৌক্তিক পর্যালোচনা

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

রচনা: আবদুল মুকিত মুখতার

Publishing Dates

Printed Edition: May 2011, Sylhet, Bangladesh

Internet Edition: July 2017

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার, সিলেট, বাংলাদেশ।

উৎসর্গ

শায়খুল হাদীস আল্লামা মোহাম্মাদ হবিবুর রহমান সাহেবকে

যাঁর দারসে বসে হাদীস শেখার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে-

বিষয়সূচি

কথকতা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

কথা উঠেছিলো- জুমুআ'র খুতবা আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষায় দেয়া যাবে কি-না। সাথে সাথে উত্তর দিয়েছিলাম, 'যদ্দুর জানি! আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দেয়া যাবে না। ভিন্ন ভাষায় খুতবা দিয়ে জুমুআ'র নামায পড়লে, নামায আদায় হবে না।'

যারা বিষয়টি জানতে চেয়েছিলেন, তাদেরকে এরকম বলে তো চলে এসেছি। কিন্তু নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারছি না। সময় করে টেলিফোনে জিজ্ঞেস করলাম শায়খুল হাদীস হাফিয মাওলানা আবদুল জলিল সাহেবকে। তিনি বললেন, 'ভিন্ন ভাষায় খুতবা দান মাকরূহ,' সাথে সাথে আবার বললেন, 'মাকরূহ তাহরিমী'। সমাজ ভদ্রতা শেষ করে তাঁর সাথে টেলিফোন আলাপচারিতা শেষ করলাম।

কিছুক্ষণ পর টেলিফোনে কথা হলো অনুজপ্রতিম মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলালের সাথে। ভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনায় চলে এলো জুমুআ'র খুতবায় ভাষা সংক্রান্ত বিষয়টি। তিনি বললেন, 'আমি যতোটুকু জানি- হানাফী মাযহাবের মতে ভিন্ন ভাষায় জুমুআ'র খুতবা মাকরূহ'। অবশ্য 'মাকরূহ তাহরিমী' নয়। কারণ 'মাকরূহ তাহরিমী' হচ্ছে হারামের কাছাকাছি।

দু'টো ভিন্ন অভিমতের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কারের লক্ষ্যেই তথ্যানুসন্ধানের প্রয়াস। 'মাকরূহ' না 'মাকরূহ তাহরিমী' আবিষ্কার করা মূল উদ্দেশ্য নয়। তবে উল্লিখিত দু'জন আলিম দ্বীনি সম্পর্কের দিক থেকে একজন আমার অগ্রজ এবং অন্যজন অনুজ। আর দু'জনের অনুসন্ধিৎসু মানসিকতায় আমি এতোটাই আপ্লুত যে, তাদের অবয়বে নায়েবে-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলোকন করছি। একই সাথে আরেক নায়েবে-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন মাওলানা জালালুদ্দীন কালারুকী, যার কাছে আমি সর্বদাই ঋণী। তাদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় হাদীস শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমার এই আগ্রহকে কবুল করুন। আমীন।।

আবদুল মুকিত মুখতার
অক্টোবর ২০১০
লন্ডন

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিয়তের উপরই সমস্ত কাজ নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যে হিজরত করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিয়তে (উদ্দেশ্যে) তার হিজরত (পরিগণিত) হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিয়তে। আর যে হিজরত করে দুনিয়া লাভ করা অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার নিয়তে, তার হিজরত হয় তারই নিয়তে, যার নিয়তে সে হিজরত করেছে।" (বুখারী ও মিশকাত)

'নিয়ত'-এর হাদীসটি 'সর্বপ্রথম হাদীস' হিসেবে বুখারী শরীফে সন্নিবেশিত হয়েছে। মূল বুখারী শরীফের সাতটি অধ্যায়ের প্রথমেই নিয়ত বা সংকল্পের হাদীসটি সাত বার উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কেও বিরাট ভূমিকা লেখা হয়েছে। স্বয়ং ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ভূমিকায় 'নিয়ত'-এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং ঐ আলোকে বলা যায়, আমাদের নিয়তের বিশুদ্ধতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে গ্রন্থের শুরুতে হাদীসটি উল্লেখ করার কারণটা সুস্পষ্ট। যেহেতু- কোন্ পাঠক কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে পস্তকখানা পাঠক করছেন, জানি না। অতএব পাঠকের নিয়তের উপরই নির্ভর করবে পুস্তক রচনার গ্রহণযোগ্যতা ও স্বার্থকথা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লিআলা রাসূলিহিল কারীম-

সূচনা

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কাউকে অন্যায় কাজ করতে দেখে, সে যেনো তাকে প্রতিহত করে, যদি এতে তার ক্ষমতা না থাকে তবে যেনো প্রতিবাদ করে, এটাও যদি করতে না পারে তবে যেনো অন্তর দ্বারা তাকে ঘৃণা করে এবং এটা হচ্ছে দুর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ।" (বুখারী আস-সাহীহ)

জুমুআ'র খুতবায় আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করা যায় কি না

উক্ত প্রশ্নটি ইদানিং হাটে-ঘাটেও বাজারজাত হয়ে গেছে। ইসলামকে আধুনিকায়ন করার তৎপরতা থেকেই উক্ত প্রশ্ন বা বিষয়টির জন্ম। এ কথা সকলেই জানেন যে, ইসলাম সর্বদাই বিজ্ঞানসম্মত, যৌক্তিকতার উর্ধ্বে এবং চির আধুনিক। কিন্তু তারপরও 'ইসলামকে আধুনিক' করার তৎপরতা মূলতঃ ইয়াহূদী চক্রান্ত থেকেই জন্মলাভ করেছে। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অপ্রতিরোধ্য ইসলামী বিজয়কে রোধ করার একটি মাত্র পথই বাকী ছিলো। আর এ পথটাও আবিষ্কার করেছিলো ইয়াহূদীরাই। যাকে বলে- "If you can't beat them, join with them" অর্থাৎ 'বিজয়ী হতে না পারলে বন্ধু সেজে ভেতরে ঢুকে যাও।' এই তৎপরতা শুরু হয়েছিলো সেই ২৪ হিজরীতে সায়্যিদিনা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফত আমলে। তখন সেই গোষ্ঠির নাম ছিলো খাওয়ারিজ বা খারিজী।

ষড়যন্ত্র ও ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে আলোচনার আগে আমরা দেখবো শরীয়তের দৃষ্টিতে খুতবা কি। প্রথমেই একটি বিষয় আমাদের জানা দরকার যে, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। এবং তিনি মনগড়া কথাও বলেন না। এটা তো ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। (সূরা নায্‌ম : ২-৪) অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, "আমি তো শুধু ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে।" (সূরা আন'আম, আয়াত ৫০-এর কিয়দাংশ)

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তুমি আমার কথাগুলো লিখতে থাকো। আল্লাহর শপথ! সত্য কথা ছাড়া আমার মুখ দিয়ে অন্য কোনো কথা বের হয় না।" (ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম ইবনে আবি শাইবা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম, সূত্রঃ তাফসীর ইবনে কাসীর বঙ্গানুবাদ ১৭ খণ্ড পৃষ্ঠা-১৩৭) অন্য আরেকটি হাদীসে সায়্যিদিনা হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আমি তোমাদেরকে যে খবর দিয়ে থাকি তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।" আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "সায়্যিদিনা হযরত আবূ হুরাইরা রাদিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি সত্য ছাড়া কিছু বলি না।' তখন কোনো একজন সাহাবী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি তো আমাদের সাথে রসিকতাও করে থাকেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তখনও আমি সত্য কথাই বলে থাকি (রসিকতার সময়েও আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের হয় না।)" (ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, সূত্রঃ তাফসীর ইবনে কাসীর বঙ্গানুবাদ ১৭ খণ্ড পৃষ্ঠা ১৩৬-১৩৭)

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। যেমন আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গাম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গাম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা (সাহাবায়ে কিরাম অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদী) বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা বাক্বারাহ, আয়াত ২৮৫) উল্লিখিত আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার নামই ইসলাম। এ বিষয়ে কোনো যুক্তি কিংবা যৌক্তিকতার স্থান নেই। পরিপূর্ণ মুসলমান এবং প্রকৃত মুমিন হতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে উল্লিখিত বিষয়গুলো যুক্তিহীন ও প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করতে হবে।

ফিকাহ্‌র প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, "নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো খুতবা ছাড়া জুমুআ'র নামায আদায় করেননি।" (আল-হিদায়া পৃষ্ঠা ১৫৬) তাহলে এটাও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, খুতবা না থাকলে জুমুআ'র নামাযের কোনো প্রয়োজন বা মূল্য নেই। অর্থাৎ খুতবার কারণেই জুমুআ'র নামায।

জুমুআ'র (শুক্রবার) দিনের ফযীলত

সপ্তাহে দিন সাতটি। তন্মমধ্যে শুক্রবার অত্যন্ত পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা, মহান আল্লাহ তাআলা এই দিনেই মানুষকে সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ (নিয়ামত) দান করেছেন। শুক্রবার দিনেই প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। 'হাদীসে আছে, ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে জুমুআর দিন দেয়া হলে তারা এতে বিরোধ করলো। তাই তাদেরকে জুমুআ থেকে বঞ্চিত করে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। এ উম্মতের জন্যে এ দিনকে ঈদ করা হয়েছে।' (এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৭)

মুসলিমদের জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এটা বিশাল অনুগ্রহ। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তিনি যাকে ইচ্ছা নিজের বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।" (আল- ইমরান আয়াত ৭৪) মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি ফযীলতপূর্ণ শুক্রবার দিনকে দান করাও একটি বিরাট অনুগ্রহ। হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বহুল প্রচারিত 'বেহেশতি জেওর' গ্রন্থে লিখেছেন, 'অন্তত সপ্তাহে একবার বিশাল আকারের গণজমায়েতের মাধ্যমে ইবাদত করার জন্যেই আল্লাহ তাআলা শুক্রবার দিনকে দান করেছেন। পূর্ববর্তী কিতাবীদেরকেও ঐ দিন ইবাদত করার হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাতে মতভেদ সৃষ্টি করে কেউ শনিবার ও কেউ রবিবার নিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর মনঃপুত দিবস শুক্রবার কেউই পায় নাই। তা দান করা হয়েছে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে।' (বঙ্গানুবাদ বেহেশতী জেওর পৃষ্ঠা-২৪২)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অনুগ্রহ সম্পর্কে হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, সুপথ প্রদর্শন তো আল্লাহর অধিকারে রয়েছে। তিনি মুমিনদের

অন্তরকে ঐ প্রত্যেক জিনিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যে প্রস্তুত করে দেন যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন। ঐ দলীলগুলোর উপর তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রাখার সৌভাগ্য লাভ হয়। যদিও তোমরা নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী গোপন রাখছো তথাপি যারা ভাগ্যবান ব্যক্তি, তাঁরা তাঁর নবুওয়াতের বাহ্যিক নিদর্শন একবার দেখেই চিনে নেবে।' অনুরূপভাবে তারা তাদের লোককে বলতো- 'তোমাদের নিকট যে বিদ্যা রয়েছে তা তোমরা মুসলমানদের নিকট প্রকাশ করো না, নতুবা তারা তা শিখে নেবে, এমনকি তাদের ঈমানী শক্তির কারণে তোমাদের চেয়েও বেড়ে যাবে কিংবা আল্লাহ তাআলার নিকট তাদের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ স্বয়ং তোমাদের গ্রন্থের মাধ্যমেই তারা তোমাদের উপর দোষারূপ করবে এবং তোমাদেরই উপর তোমাদের দলীল প্রতিষ্ঠিত করে বসবে।' আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা বলে দাও যে, অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে রয়েছে, তিনি যাকে ইচ্ছে করেন তাকেই (অনুগ্রহ) দিয়ে থাকেন। সমস্ত কার্য তাঁরই অধিকারে রয়েছে। তিনিই প্রদানকারী। তিনি যাকে ইচ্ছে করেন ঈমান আমল এবং অনুগ্রহ রূপ সম্পদ পরিপূর্ণ রূপে দিয়ে থাকেন। আর যাকে ইচ্ছে করেন সত্যপথ হতে অন্ধ, ইসলামের কালেমা হতে বধির এবং সঠিক বোধ হতে বঞ্চিত করেন। তাঁর সমস্ত কাজই নিপুণতাপূর্ণ এবং তিনি প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী। তিনি যাকে চান স্বীয় করুণার সাথে নির্দিষ্ট করে নেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল। হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর সীমাহীন অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ শরীয়ত তোমাদেরকে প্রদান করেছেন।' (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা আল-ইমরান পৃষ্ঠা ৯৪)

"হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র রিওয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার কাছে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্‌সালাম) আগমন করলেন। তাঁর হাতে একটি উজ্জ্বল আয়না

ছিলো। তিনি বললেন, এটা জুমুআ। যা আল্লাহ তাআলা আপনাকে দান করেছেন, যাতে আপনার এবং আপনার উম্মতের জন্যে এটা ঈদ হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জুমুআ দিয়ে আমাদের কি উপকার হবে? তিনি বললেন, এতে একটি সর্বোৎকৃষ্ট মুহূর্ত (সময়) আছে। যে ব্যক্তি এ সময়ে নিজের কল্যাণের জন্যে দোয়া করবে, যদি সেই কল্যাণ তার ভাগ্যে না থাকে, তবে তার তুলনায় অনেক বেশি তার জন্য সঞ্চিত রাখবেন। অথবা কেউ এ মুহূর্তে কোনো বালা-মুসিবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে যদিও সেই বালা-মুসিবত তার ভাগ্যে লিখিত রয়েছে, তবে আল্লাহ তাআলা বালা-মুসিবত অপেক্ষা বড় বালা-মুসিবত থেকেও তাকে রক্ষা করবেন। আমাদের কাছে এ দিন সকল দিনের সর্দার। আমরা একে আখেরাতে يوم المزيد বৃদ্ধির দিন বলবো। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্‌সালাম) বললেন, আপনার পরওয়ারদিগার জান্নাতে একটি শুভ্র ও মিশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধযুক্ত উপত্যকা নির্দিষ্ট করেছেন। জুমুআর দিন হলে তিনি ইল্লিয়্যিন থেকে তথায় তাঁর সিংহাসনে অবতরণ করবেন এবং মানুষের জন্যে দ্যুতি বিকিরণ করবেন, যাতে তারা তাঁকে দেখতে পায়।" (এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩২৭)

অতএব উম্মতে মুহাম্মাদী যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, সেহেতু তাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দিন অর্থাৎ শুক্রবার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত অর্থাৎ জুমুআর নামায ও খুতবা ধার্য করা হলো।

জুমুআ'র ফযীলত সম্পর্কে হাদীসসমূহ

১. মুসলিম শরীফে আছে- 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সপ্তাহের দিনসমূহের মধ্যে জুমুআ'র দিনই সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এই দিনেই হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। এই

দিনেই তাঁকে জান্নাতে স্থান দেওয়া হয়েছিলো। এই দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিলো এবং এই দিনেই কিয়ামত (শেষ বিচার) সংঘটিত হবে।' (বঙ্গানুবাদ বেহেশতী জেওর পৃষ্ঠা-২৪২)

২. হযরত আউস ইবনে আউস সাকাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, 'যে ব্যক্তি জুমুআ'র দিন ভালোভাবে গোসল করে এবং সকালেই মসজিদ পানে রওয়ানা হয়ে যায়, পায়ে হেঁটে যায়, সওয়ার হয় না, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসে মনোযোগের সাথে খুতবা শুনে এবং বাজে কথা বলে না, সে প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে সারা বছরের রোযা ও সারা বছরের কিয়ামের (রাত্রে দাঁড়িয়ে ইবাদত) পূণ্য লাভ করে।' সূত্রঃ তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা জুমুআ পৃষ্ঠা ৪৯৭)

৩. হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জুমুআ'র দিন যে ব্যক্তি নাপাক অবস্থার গোসলের ন্যায় (অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে) গোসল করে আউয়াল বা প্রথম সময়ে মসজিদে গেলো সে যেনো একটা উট কুরবানী করলো, যে দ্বিতীয় সময়ে হাজির হলো সে যেনো একটা গরু কুরবানী করলো, যে তৃতীয় সময়ে পৌঁছলো সে একটা মেষ কুরবানী করার সওয়াব পেলো, যে হাজির হলো চতুর্থ সময়ে সে যেনো সাদকাহ করলো একটা মোরগ এবং যে হাজির হলো পঞ্চম সময়ে, একটা ডিম আল্লাহর পথে সাদকাহ করার মতো পূণ্য সে লাভ করলো। অতঃপর যখন ইমাম (খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে) বের হন তখন ফেরেশতামণ্ডলী হাজির হয়ে যিকির শুনতে থাকেন। (বুখারী ও মুসলিম, সূত্র- তাফসীর ইবনে কাসীর সূরা জুমুআ, পৃষ্ঠা ৪৯৭)

৪. মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে রয়েছে- 'জুমুআ'র রাতের ফযীলত শবে কদর

অপেক্ষা অধিক। কারণ, এই রাত্রেই হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মাতৃগর্ভে শুভাগন করে ছিলেন এবং হযরতের শুভাগমনের মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত ও অশেষ মঙ্গল নিহিত। (বঙ্গানুবাদ বেহেশতী জেওর পৃষ্ঠা-২৪৩)

৫. বুখারী শরীফে আছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জুমুআ'র দিনে (সমস্ত দিনের মধ্যে) এমন একটি সময় আছে যে, সে সময় যে কোনো মুমিন বান্দা আল্লাহর নিকট যা কিছু চাইবে, তা-ই পাবে।' এই সময়টি যে কোন্ সময় তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে উল্লিখিত বিশেষ সময়টি নির্ধারণ করতে গিয়ে হাদীসের ব্যাখ্যাকার ইমামগণ দু'টো মতামত ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে একদলের অভিমত হচ্ছে- পার্থনা কবুলের বিশেষ এই সময়টি হচ্ছে জুমুআ'র নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের ভেতর। আর দ্বিতীয় দলের অভিমত হচ্ছে- দিনের শেষভাগে অর্থাৎ আছরের নামাযের পর (মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে)।

অবশ্য দ্বিতীয় এই অভিমতটির সাথে বিরাট একদল আলিম ঐকমত্য পোষণ করেন এবং তাঁদের বর্ণনায় বহু সহীহ হাদীস রয়েছে। শায়খ দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। কেননা হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা জুমুআ'র দিন খাদিমকে বলে দিতেন যে, জুমুআ'র দিন শেষ হওয়ার সময় আমাকে খবর দিও। হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা শুক্রবার দিনের শেষভাগে আছরের পর সব কাজকর্ম ছেড়ে আল্লাহর যিকির এবং দোয়ায় মশগুল থাকতেন। (বঙ্গানুবাদ বেহেশতী জেওর পৃষ্ঠা-২৪৩)

৬. আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত রয়েছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জুমুআর দিনই সর্বাপেক্ষা অধিক ফযীলতের দিন। এই দিনেই কিয়ামতের জন্য সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। তোমরা এই

দিনে আমার উপর বেশী করে দুরূদ পাঠ করো। ঐ দিন তোমরা যখন দুরূদ (বা সালাত) পড়ো তৎক্ষণাৎ তা আমার সামনে পেশ করা হয় (এবং তৎক্ষণাৎ আমি তার প্রতোত্তর ও দোয়া দেই)। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার সামনে কিরূপে তা পেশ করা হয়? অথচ মৃত্যুর পর তো আপনার হাড় পর্যন্ত থাকবে না। তখন হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (জেনে রাখো!) আল্লাহ তাআলা জমিনের জন্য নবীদের শরীর হজম করা হারাম করে রেখেছেন।' (বঙ্গানুবাদ বেহেশতী জেওর পৃষ্ঠা-২৪৩-২৪৪)

৭. তিরমিযী শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা স্বীয় পবিত্র কালামে পাকে 'শাহিদ' শব্দের কসম করেছেন। এর অর্থ জুমুআ'র দিন। আল্লাহর নিকট জুমুআ'র দিন অপেক্ষা ভালো দিন আর নাই। এই দিনে এমন একটি সময় আছে, সেই সময় যে কোনো মুমিন বান্দা আল্লাহর নিকট যে কোনো দোয়া করলে তা কবুল করবেন এবং যে কোনো বিপদ (বালা-মুসিবত) হতে রক্ষা পাবার জন্যে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাকে সে বিপদ হতে রক্ষা করবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'শপথ রাশিচক্র সমন্বিত আকাশের, এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, শপথ জুমুআ ও আরাফাত দিবসের।' (সূরা বুরূজ, আয়াত ১-২)

হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইয়াওমিল মাওউদ' দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। শাহিদ হলো জুমুআ'র দিন। যেসব দিনে সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয় সেগুলোর মধ্যে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ দিন হলো এই জুমুআ'র দিন। এই দিনের মধ্যে একটা সময় এমন

রয়েছে যে, ঐ সময়ে বান্দা যে কল্যাণ প্রার্থনা করে তা কবুল হয়ে যায়। আর কেউ অকল্যাণ হতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করলে তাকে পরিত্রাণ দেয়া হয়। আর মাশহুদ হলো আরাফার দিন। (তাফসীর ইবনে কাসীর সূরা বুরূজ, ১৮ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬)

৮. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম।' (সূরা মায়িদাহ্ আয়াত ৩ এর কিয়দংশ) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সায়্যিদিনা হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা এ দ্বীন সম্পর্কে আরও বেশি কিছু আশা করেছিলাম। কিন্তু এটা যখন পূর্ণতা লাভ করেছে, তখন সাধারণ নিয়মানুযায়ী এখন তা অবণতির দিকে যেতে পারে।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তুমি সত্য কথাই বলেছো।' (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা মায়িদা ৬-৭ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭১৬-৭১৭)

উল্লিখিত হাদীসের অর্থের স্বপক্ষে একটি সহীহ হাদীস এসেছে, হাদীসটি নিম্নরূপ-

'ইসলাম স্বল্প সংখ্যক লোক নিয়ে শুরু হয়েছিলো এবং অতিসত্বরই তা স্বল্প সংখ্যার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব এ সংখ্যক লোকের জন্যে সুসংবাদ।' ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তারিক ইবনে শিহাব হতে বর্ণনা করেন যে, একজন ইয়াহূদী সায়্যিদিনা হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে বলেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থে একটি আয়াত আছে, তা যদি ইয়াহূদীদের উপর অবতীর্ণ হতো তবে আমরা ঐ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিনকে একটি ঈদের দিন হিসেবে গণ্য করতাম।' তখন হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আয়াতটি কি? উত্তরে

ইয়াহূদী বললো, 'আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম' এ আয়াতটি। হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, 'আল্লাহর শপথ! যে দিনে ও যে সময়ে উক্ত আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো, আমি উক্ত দিন ও সময় সম্পর্কে অবগত আছি। ওটা ছিলো আরাফার দিন শুক্রবার সন্ধ্যার সময়।' ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম তাদের গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি স্থান দিয়েছেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা মায়িদা ৬-৭ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭১৬-৭১৭)

৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা অপেক্ষাও জুমুআ'র দিন অধিক মর্যাদাশীল। (ইবনে মাযাহ, সূত্র- বঙ্গানুবাদ বেহেশতী জেওর পৃষ্ঠা-২৪৪)

১০. হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে (মুমিন) মুসলমান বান্দার মৃত্যু জুমুআ'র দিনে বা জুমুআ'র রাত্রে হয়, আল্লাহ পাক তাঁকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করেন। (তিরমিযী, সূত্র- বঙ্গানুবাদ বেহেশতী জেওর পৃষ্ঠা-২৪৪)

১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জুমুআ'র রাত নূরে ভরা রাত এবং জুমুআ'র দিন নূরে ভরা দিন। (মিশকাত শরীফ, সূত্র- বঙ্গানুবাদ বেহেশতী জেওর পৃষ্ঠা-২৪৪)

১২. জান্নাতবাসীগণ যেদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পাবেন, সেই দিনটি হবে শুক্রবার। (বঙ্গানুবাদ বেহেশতী জেওর পৃষ্ঠা-২৪৫-২৪৬)

১৩. প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় দোযখের আগুনের তেজ বাড়িয়ে দেয়া হয়।

কিন্তু জুমুআ'র দিন দ্বিপ্রহরে শুধুমাত্র জুমুআ' বারের বরকতে তা হয় না। (বঙ্গানুবাদ বেহেশতী জেওর পৃষ্ঠা-২৪৬)

১৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে মুসলিমগণ! জুমুআ'র দিনকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য ঈদের দিন ধার্য করেছেন। অতএব, এই দিনে তোমরা গোসল করবে, ভালো কাপড় পরবে, মিসওয়াক করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে। *(উল্লিখিত হাদীসগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে হাকিমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত বেহেশতী জেওর দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৪১-২৫০ থেকে।)*

১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেকেরই জুমুআ'র নামাযে উপস্থিত হবার পূর্বে গোসল করা আবশ্যক। (বুখারী শরীফ বঙ্গানুবাদ পৃষ্ঠা ১৪৯)

১৬. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের উপর জুমুআ'র দিন গোসল করা ওয়াজিব। (বুখারী শরীফ বঙ্গানুবাদ পৃষ্ঠা ১৪৯)

১৭. সায়্যিদিনা আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে গোসল করে যথাসম্ভব প্রথম ওয়াক্তে জুমুআ'র নামাযের জন্য উপস্থিত হবে, সে যেনো একটি উট কুরবানী করেছে। তারপর যে আসবে, সে যেনো একটি দুম্বা (মেষ) কুরবানী করেছে। তারপর যে আসবে, সে যেনো একটি মোরগ কুরবানী করেছে। তারপর যে আসবে, পঞ্চমাংশে যে এসেছে সে যেনো একটি ডিম সদকা করেছে। তারপর যখন ইমাম

খুতবার জন্য অগ্রসর হবেন, তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ যিকির শুনার জন্য মসজিদে চলে আসেন।' (বুখারী শরীফ বঙ্গানুবাদ পৃষ্ঠা ১৫১)

১৮. "হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষ শুরু হলো। ঐ সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জুমুআ'র দিন খুতবারত ছিলেন। এমতাবস্থায় এক গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে আসলো এবং হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অনাবৃষ্টির দরুন পশুপাল মৃতপ্রায়, বাচ্চাকাচ্চা অনাহারী এবং মানুষ ধ্বংসের সম্মুখীন। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন! আল্লাহ যেনো আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তৎক্ষণাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইখানা হাত উঠালেন এবং দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন।'

উপস্থিত লোকগণও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাত উঠালেন এবং দোয়া করলেন। ঐ সময় আকাশে মেঘের চিহ্নও ছিলো না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও হাত নামাননি, ইতোমধ্যে পর্বতাকৃতির মেঘমালা মদীনার আকাশে ছুটে আসতে লাগলো। তিনি মিম্বর থেকে নিচে আসার পূর্বেই এমন বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেলো যে, মসজিদের খেজুর পাতার ছাদ হতে পানি পড়ে তাঁর দাড়ি মুবারকের উপর পানি বইতে লাগলো। বৃষ্টির দরুন আমাদের বাড়ীতে পৌঁছা কষ্টকর হয়ে পড়লো। পরবর্তী জুমুআ'র দিন খুতবার সময় ঐ ব্যক্তিই কিংবা অন্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো এবং তার সাথে সকলেই চিৎকার করে উঠলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বাড়ীঘর ধসে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে, চলাচলের অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। দোয়া

করুন, আল্লাহ তাআলা যেনো আমাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকী হাসি দিলেন এবং উভয় হাত তুলে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আমাদের থেকে দূরের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে বৃষ্টি বর্ষিত হোক। আমাদের উপরে নয়, বড় বড় পাহাড়-পর্বতের উপর, ছোট ছোট পাহাড় এবং পার্বত্য ও সমতল ভূমিতে, বাগবাগিচা ও খেত খামারে বর্ষিত হোক।'

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের ইশারার সাথে সাথে মেঘখণ্ডগুলো মদীনার আকাশ থেকে পার্শ্ববর্তী দূর এলাকার দিকে চলে গেলো এবং বর্ষিত হলো। মদীনার আকাশে মেঘের চিহ্নও থাকলো না এবং এক ফোটা বৃষ্টিও আর হলো না। নামায শেষে আমরা রৌদ্রের মধ্যে বাড়ী ফিরলাম। দূরবর্তী এলাকার বৃষ্টিপাতে 'কানাত' নামক গিরি-প্রণালী এক মাস পর্যন্ত প্রবাহমান থাকলো। ঐ সব এলাকা থেকে প্রত্যেক আগন্তুকই বৃষ্টিপাতের সংবাদ দিচ্ছিলো।" (বুখারী শরীফ বঙ্গানুবাদ পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৩)

ফিকাহ্র পরিভাষা

ফিকাহ্ শাস্ত্রের গ্রন্থগুলোতে কিছু পরিভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সকল পারিভাষিক শব্দগুলোর পৃথক পৃথক অর্থ রয়েছে। বিশেষ করে ফিকাহ্র আহকাম ও মাসাইল বুঝার জন্য এগুলোর সঠিক অর্থ জেনে মাসআলা-মাসাইলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরী। জুমুআ'র খুতবায় ভাষা ব্যবহার সংক্রান্ত মাসাইলও পারিভাষিক শব্দ এবং অর্থের একটি বিশেষ ব্যাখ্যা। যে কারণে জুমুআ'র খুতবা একটি সাধারণ ভাষণের পরিবর্তে ইসলামের একটি ইবাদত হিসেবে স্বীকৃত।

উসূলে ফিকাহ্র কিতাবে অন্তত ১১২টি পারিভাষিক শব্দ ও সংযুক্ত বাক্য

ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন- ফিকাহ্‌র একটি শব্দ হচ্ছে 'আদা'। 'আদা' শব্দটি মূলত আরবী। কিন্তু কোনো বাংলাভাষী লেখক যদি শব্দটির পারিভাষিক অর্থ জানার পর লিখেন, "যারা রমযান মাসে আদা রোজা রাখলো, তারা মুত্তাকী বা অত্যন্ত পরহেজগার।" তাহলে লেখাটি যারা পাঠ করবে, তারা হয়তো বুঝবে যে এই 'আদা' অর্থ বাঙালীদের খাবারে ব্যবহৃত রসুনের সাথী 'আদা' নয়! নিশ্চয়ই এর ভিন্ন অর্থ রয়েছে! কিন্তু কোনো মডারেট খতীব জুমুআ'র খুতবায় যদি একথাগুলো বাংলা ভাষায় বলেন, তাহলে পরদিন থেকে দেখা যাবে অধিকাংশ মুসল্লী দিবসের অর্ধেক সময় রোজা রাখছে। অথবা কেউ পনেরো দিন রোজা রেখে বাকী পনেরো দিন আরামে খাওয়া-দাওয়া করে নিজেকে মুত্তাকী ভাবতে শুরু করবে। এটা সত্য যে, এরকম ঘটনা অবশ্য এখনো মুসলিম সমাজে ঘটেনি। তবে ইসলামী শরীয়তে যুক্তিনির্ভর মাসআলা আবিষ্কার করার চেষ্টা করলে, কিংবা সরাসরি কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করে ইদানিং যারা আমল করা শুরু করেছেন, তাদের পক্ষে এরকম পরিণতি হওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে 'আদা' শব্দটির ফিকাহ্‌র পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- সময়মতো নির্দেশ পালন করা। অর্থাৎ নামায, রোজা ইত্যাদি সময় মতোই পালন করতে হবে।

উসূলে ফিকাহ্‌র পারিভাষিক শব্দ 'মাকরূহ'। মাকরূহ দুই প্রকার। এক- মাকরূহ তাহরিমী। দুই- মাকরূহ তানযিহী। ফিকাহ্‌র কিতাবের যেসকল স্থানে শুধু 'মাকরূহ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে ধরে নেয়া হয়, মাকরূহ তাহরিমী। এটাই নিয়ম। উক্তস্থানে আর পৃথকভাবে 'তাহরিমী' শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যারা উসূলে ফিকাহ্‌র এসব বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন, তাদের এটা জানাশুনা ব্যাপার। বিশেষ করে, "হানাফী ইমামগণ 'মাকরূহ' বলতে 'মাকরূহ তাহরিমী'কেই গ্রহণ করেন থাকেন।" (তথ্যসূত্রঃ- ডঃ ওয়াবা যুহাঈলী রচিত আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৬৯)

অন্যদিকে কোনো সিদ্ধান্তে বা ফাতাওয়ায় 'মাকরূহ' শব্দ ব্যবহৃত হলে এটাও শতসিদ্ধ নিয়ম যে, মাকরূহ বিষয় কখনো ব্যক্তিগত কিংবা দলবদ্ধভাবে

নিয়মিত ইবাদত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ 'মাকরূহ' কখনো 'ইবাদত'-এর অংশ হতে পারে না। এইসব কর্মকাণ্ডকে 'বিদআত' কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে 'হারাম' ঘোষণা করা হয়েছে।

খুতবা

খুতবা শব্দের শাব্দিক অর্থ ভাষণ, বক্তব্য ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তের পারিভাষিক অর্থ ধর্মোপদেশ বা খাতীব কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা। ইংরেজী ভাষায় 'খুতবা' শব্দের অর্থ Sermon বা Worship। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে- বর্তমান যুগে খুতবা শব্দের শাব্দিক অর্থকে কেন্দ্র করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, নতুন নতুন মাসআলা আবিষ্কার, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'যিক্র' বা 'খুতবা'র পবিত্রতা ধ্বংস করারই নামান্তর। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করারই সামিল। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখো এবং নিশ্চুপ থাকো যাতে তোমাদের উপর রহমত নাযিল হয়।" সূরা আ'রাফ- ২০৪

ফলে শাব্দিক অর্থ ও পারিভাষিক অর্থ ক্ষেত্র বিশেষে আত্মঘাতি রূপ লাভ করতে পারে। শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের অপব্যবহার সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনে যতোগুলো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, উচ্চারণের সাথে সাথে পাঠক ও শ্রোতাদেরকে অক্ষর ভিত্তিক সওয়াব দান করা হয়। আর এটাকেই বলা হয় Worship বা Pray বা প্রার্থনা। এই বিষয়টি সকল মুসলিমগণ যেমন জানেন, তেমনি ইয়াহূদী, খৃষ্টান ও হিন্দু ব্রাহ্মণগণও জানেন। এবং তারা নিজেরা যে সত্য গোপনকারী সে কথাও বুঝেন। ফলে মুসলমানরা যাতে আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে থাকে সে ষড়যন্ত্রই তারা করছে প্রতিনিয়ত। যেমন অতীতে বাংলাদেশী হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা পবিত্র কুরআনে

বর্ণিত এমন কিছু শব্দের সাথে সাথে 'খলীফা' শব্দটিরও বিকৃত অর্থ প্রচার করেছেন। অর্থাৎ বাংলা অভিধানে 'খলীফা' শব্দের একটি অর্থ করা হয়েছে 'দর্জি' (যে জামা-কাপড় তৈরী করে)। অথচ 'খলীফা' শব্দের পরিবর্তে 'দর্জি' উচ্চারণ করলে কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথক কোনো সওয়াব বা পুরষ্কার পাওয়া যাবে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বলুন! আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।' সূরা জুমুআহ্- **১১**

উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, "জুমুআ'র দিন মদীনায় ব্যবসার মাল আসার কারণে যেসব সাহাবী খুতবাহ ছেড়ে দিয়ে উঠে গিয়েছিলেন। তাঁদেরকে এখানে আল্লাহ তা'আলা ধমক দিচ্ছেন যে, 'এই সব লোক যখন কোনো ব্যবসা ও খেল-তামাশা দেখে তখন ওদিকে ছুটে যায় এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছেড়ে দেয়।' হযরত মুকাতিল ইবনে হিব্বান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ওটা ছিলো দাহইয়া ইবনে খালফিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যবসার মাল। তিনি জুমুআ'র দিন ব্যবসার মালসহ মদীনায় আগমন করেন এবং খবর প্রচারের উদ্দেশ্যে ঢোল বাজাতে শুরু করেন। তিনি তখন পর্যন্ত মুসলমান হননি। ঢোলের শব্দ শুনে মাত্র কয়েকজন ছাড়া সবাই মসজিদ হতে বেরিয়ে পড়েন। মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, মাত্র বারো জন লোক বসে থাকেন এবং বাকী সবাই ঐ বাণিজ্যিক কাফেলার দিকে ছুটে যান। ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে আবূ ইয়ালায় হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে যে হাদীসটি বর্ণিত আছে- তাতে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি তোমরা সবাই চলে যেতে এবং তোমাদের একজনও (খুতবার মজলিসে) বাকী না থাকতো তবে যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এই উপত্যকা আগুন হয়ে তোমাদের উপর

পতিত হতো।' যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন।" (তাফসীর ইবনে কাছির, সূরা জুমুআ ৫০০-৫০১)

অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে এই ঘটনাটিকে এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, সে সময় মদীনায় ছিলো খাদ্যাভাব। একপ্রকার দূর্ভিক্ষ। অন্যদিকে- জুমুআর খুতবা তখন দেওয়া হতো নামাযের পর। নও-মুসলিম সাহাবায়ে কিরাম মনে করেছিলেন যে, নামায যেহেতু শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং উঠে যাওয়াটা সমীচিন। কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের কাছে এটা সহ্য হয় নাই।

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে এটাও স্পষ্ট যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দেয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন সাহাবীগণের উঠে যাওয়াটা আল্লাহর কাছে মোটেই পছন্দনীয় হয়নি। সুতরাং জুমুআ'র দিনের এই খুতবা গতানুগতিক কোনো সাধারণ ভাষণের মতো হতেই পারে না। যেহেতু এই খুতবা বা ভাষণে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রত্যক্ষ নির্দেশ রয়েছে, ফলে তা ইবাদত হিসেবেই স্বীকৃত। উল্লিখিত আয়াতের শব্দাবলি এদিকেই ইঙ্গিত করে। যে কারণে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে তাবিঈ, তবে-তাবেঈ কিংবা তৎপরবর্তী যুগেও খুতবায় আরবী ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করা হয়নি।

এছাড়াও আল্লাহ্র ভাষা আরবী, আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষা আরবী, ফেরেশতাগণের ভাষা আরবী, পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবী, হাদীসের ভাষা আরবী, ইসলামের ভাষা আরবী, মুসলিমদের ধর্মীয় ভাষাও আারবী এবং কবর ও হাশরের ভাষাও হবে আরবী। সুতরাং জুমুআ'র খুতবা আরবী হওয়াই স্বাভাবিক।

খুতবায় আরবী ভাষা ব্যবহারের ফিকহী প্রমাণ

১. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "মুমিনগণ! জুমুআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণের (যিক্‌র) পানে দ্রুত অগ্রসর হও এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা বুঝো। (সূরা জুমুআহ্ আয়াত- ৯)

উপরোক্ত আয়াতে 'যিকরুল্লাহ' শব্দের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের একাধিক উক্তি রয়েছে। তবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য উক্তি যেমন- তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে আহকামূল কুরআন ও তাফসীরে জাসসাস ইত্যাদিতে যিকরুল্লাহ অর্থ জুমুআর নামায ও খুতবা দু'টোই নির্দেশিত হয়েছে। (খুতবার ভাষা আহকাম ও মাসায়েল পৃষ্ঠা- ১৪-১৫)

এমনকি তাফসীর ইবনে কাছির গ্রন্থেও এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন 'হযরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বান্দা তখনই আল্লাহর অধিক যিকিরকারী হতে পারে যখন সে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর যিকর করে।' (তাফসীর ইবনে কাছির, সূরা জুমুআ' পৃষ্ঠা- ৫০০) যেহেতু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন, যখন সূরা জুমুআ'র ঐ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এছাড়া খুতবা ছাড়া জুমুআ নেই। খুতবার কারণেই জুমুআ ফরয হয়েছে। অর্থাৎ জুমুআ'র নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুতবা শর্ত। আর খুতবা শুদ্ধ হওয়ার জন্য নির্ধারিত সময় ও কুরআন শরীফ থেকে তিলাওয়াত অপরিহার্য বা ফরয। হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বহুল প্রচারিত বেহেশতী জেওর গ্রন্থে লিখেছেন, 'খুতবার মধ্যে ১২টি কাজ সুন্নত।

যথা- ১. দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া। ২. (পর পর) দুই খুতবা পড়া। ৩. দুই খুতবার মাঝখানে ৩ বার সুবহানাল্লাহ বলা যায় সে পরিমাণ সময় বসা। ৪. ওজু-গোসলের প্রয়োজন থেকে পবিত্র হওয়া। ৫. খুতবা পাঠকালে উপস্থিত মুসল্লীগণের দিকে মুখ রাখা। ৬. খুতবা শুরু করার আগে মনে মনে اعوذ با اللهّ من الشيطان الر جيم বলা। ৭. লোকেরা শুনতে পারে সে পরিমাণ আওয়াজের সাথে খুতবা পড়া। ৮. খুতবার মধ্যে নিয়মিত ৮ টি বিষয় বর্ণিত হওয়া, যথা- ক) আল্লাহর শোকর, খ) আল্লাহর প্রশংসা, গ) তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য, ঘ) দুরুদ পাঠ করা, ঙ) কিছু নসিহত প্রদান, চ) কুরআন শরীফ থেকে কয়েকটি আয়াত বা সূরা পাঠ করা, ছ) দ্বিতীয় খুতবায় উপরোক্ত বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি করা, জ) প্রথম খুতবায় যে স্থানে নসিহত ছিলো দ্বিতীয় খুতবায় সেখানে সমস্ত মুসলমানের জন্য দুআ করা। এই ৮ প্রকার সুন্নতের বর্ণনা হচ্ছে খুতবার সুন্নাত। ৯. খুতবা অত্যন্ত লম্বা না করা, (বরং নামাযের সমান সমান) অথবা নামাযের চেয়ে ছোট রাখা। ১০. মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া। মিম্বর না থাকলে লাঠি, ধনুক বা তলোয়ারের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খুতবা পড়া যায়। কিন্তু মিম্বর থাকা সত্ত্বে লাঠি হাতে লওয়া বা হাত বেঁধে খুতবা পড়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১১. উভয় খুতবাই আরবী ভাষায় (এবং গদ্যে) হওয়া। আরবী ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় খুতবা পড়া বা অন্য ভাষায় পদ্য ইত্যাদি মিলিয়ে পড়া মাকরূহ তাহরিমী। ১২. সমস্ত মুসল্লীগণ খুতবা শোনার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়ে ইমামের দিকে মুখ করে বসা। ছানী (দ্বিতীয়) খুতবায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওলাদ, আসহাব এবং বিবি সাহেবাগণের প্রতি বিশেষতঃ খুলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরত হামযা ও হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার জন্য দুআ করা মুস্তাহাব। সাময়িকভাবে মুসলমান বাদশার জন্য দোয়া করা জায়েয, কিন্তু তার মিথ্যা প্রশংসা করা মাকরূহ তাহরিমী। (সূত্র- বঙ্গানুবাদ বেহেশতী

জেওর পৃষ্ঠা ২৫২-২৫৩)

হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, জুমুআর খুতবায় আরবী ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করা মাকরূহ তাহরিমী।

২. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইমাম যখন জুমুআর খুতবাদান উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসেন, তখন ফেরেশতাগণ যিকির (খুতবা) শোনার জন্যে সেখানে উপস্থিত হন। (বুখারী, খণ্ড-১ সূত্রঃ খুতবার ভাষা আহকাম ও মাসায়েল পৃষ্ঠা ১৪)

হুজুর-পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইমাম যখন খুতবাদান উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসেন, তখন ফেরেশতাগণ তাঁদের খাতাপত্র বন্ধ করে যিকির (খুতবা) শোনার জন্যে মনোযোগী হয়ে পড়েন।' (বুখারী, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা ১২৭, সূত্রঃ খুতবার ভাষা আহকাম ও মাসায়েল পৃষ্ঠা ১৪)

উপরোক্ত হাদীস দুটিতে উল্লেখিত যিক্‌র শব্দের অর্থকে খুতবা হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারী তৃতীয় খণ্ডের ১৮ পৃষ্ঠায়। (খুতবার ভাষা আহকাম ও মাসায়েল পৃষ্ঠা ১৪)। সুতরাং ফেরেশতাগণ যে যিকির শোনার জন্যে সকল কাজকর্ম স্থগিত করে দিচ্ছেন, তা কি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাসনতান্ত্রিক কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ? না-কি আল্লাহর নির্দেশিত পৃথক কোনো পরোক্ষ ওহী? এই বিষয়টি পর্যালোচনা করেই সকল মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরাম জুমুআ'র খুতবায় আরবী ভাষা ব্যবহার অপরিহার্য মনে করেন। *পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।*

৩. হানাফী মাযহাবের ইমাম আল্লামা ছরখছী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'ইমামের পক্ষে খুতবায় সাধারণ আলাপচারিতার মতো বক্তব্য

পেশ করা উচিত নয়। কেননা, খুতবা হলো এক সুবিন্যস্ত যিক্‌র।' (আল মাবছুত খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-২৭)

উপরোল্লিখিত কুরআন শরীফের আয়াত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস এবং ইমাম ছরখছী'র উক্তি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, খুতবা অর্থ আল্লাহর যিক্‌র। এটা সাধারণ ওয়াজ-নসীহত নয়। তবে আনুসাঙ্গিক হিসেবে ওয়াজ নসীহত খুতবার অন্তর্ভূক্ত। (আহ্‌সানুল ফাতাওয়া, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ১৫১)

৪. ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে খুতবায় কেবল একবার আলহামদু লিল্লাহ বা একবার ছুবহানাল্লাহ্ পাঠ করলেও যথেষ্ট হয়। অর্থাৎ এতে খুতবার ফরজ আদায় হয়ে যায়। (আল মাবছুত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা- ৩০) একথা থেকে বুঝা যায় যে খুতবা অর্থ ওয়াজ-নসীহত নয়, বরং আল্লাহর যিক্‌র। কেননা সাধারণ ওয়াজ নসীহত শ্রবণ করে আলহামদুলিল্লাহ্ বা ছুবহানাল্লাহ্ বলার পূর্ণতা লাভ হয় না।

৫. হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফিকাহ গ্রন্থ 'আল হিদায়া' এর ব্যাখ্যাকার ইমাম আল্লামা ইবনুল হুমাম এর মতামত বাহরুর রায়েক গ্রন্থে (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা- ১৪৪) উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'জুমুআর খুতবা হলো জুমুআর নামাযের অন্যতম শর্ত।' সুতরাং খুতবার অপর নাম ওয়াজ-নসীহত হলে একে জুমুআর নামাযের পূর্বশর্ত করার কোনো হেতু থাকতে পারে না।

৬. জুমুআর খুতবার জন্যে যোহরের ওয়াক্ত হওয়াও অন্যতম শর্ত। ওয়াক্ত আসার আগে খুতবা শুদ্ধ হয় না। সুতরাং এখানেও একই প্রশ্ন। খুতবার উদ্দেশ্য ওয়াজ নসীহত হলে, একে সময় বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ কি? ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন, 'সূর্য পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়ার আগে খুতবা দিয়ে, সূর্য ঢলে যাবার পর জুমুআর নামায আদায়

করলে (নামায ও খুতবা) কোনোটাই শুদ্ধ হবে না। (বাহরুর রায়েক ২য় খণ্ড)

৭. খুতবার ওয়াজিব আদায়ের জন্যে কেবল পাঠ করাই যথেষ্ট, শুনা বা বুঝা আবশ্যক নয়। সুতরাং কতিপয় বধির বা ঘুমন্ত লোকের পাশে খুতবা পাঠ করে নামায পড়া হলে তা শুদ্ধ হবে (ফতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১৩)। অতএব জুমুআ'র খুতবার উদ্দেশ্য যদি ওয়াজ বা ভাষণ হতো, তবে উক্ত পরিস্থিতিতে জুমুআ'র নামায ও খুতবা শুদ্ধ হওয়ার কথা ছিলো না। (খুতবার ভাষা আহকাম ও মাসায়েল পৃষ্ঠা ১৬)

৮. খুতবা পাঠের পর খাতীব যদি অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং খুতবা ও নামাযের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়, তবে খুতবা পুনরায় পাঠ করা আবশ্যক- যদিও একই শ্রোতা হয় (বাহরুর রায়েক, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ১৭৪)। সুতরাং খুতবাকে প্রার্থনা বা ইবাদত হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। তাই খুতবা আরবী ভাষায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৯. খুতবা শোনা ও চুপ থাকা ওয়াজিব। খুতবা চলাকালে মুখে দরূদ বা তাসবীহ পাঠ এবং সালামের জবাব দেওয়া জায়েয নয়। খুতবার বিষয়বস্তু আগে থেকে মুসল্লীগণের জানা থাকলেও খুতবা পাঠকালে তা নিরবতার সাথে শোনা ওয়াজিব, (আহসানুল ফাতাওয়া)। সুতরাং প্রশ্ন জাগে, খুতবা সাধারণ ওয়াজ বা ভাষণ হলে তাসবীহ তাহলীল থেকে নিষেধ করা হয় কেনো? অথচ ওয়াজ নসীহত চলাকালে হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনলে দরূদ পাঠ করা শ্রোতার জন্যে আবশ্যক বা ওয়াজিব হয়ে যায়। (খুতবার ভাষা আহকাম ও মাসায়েল পৃষ্ঠা ১৬-১৭)

১০. ইমাম জাসসাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আহকামুল কুরআন গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৫৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন, "সায়্যিদিনা হযরত উমার

রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, খুতবার কারণে জুমুআর নামাযকে চার রাকাআতের স্থলে দু'রাকাত করা হলো।" ফলে 'ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের অনেকে জুমুআর খুতবাকে দু'রাকাত নামাযের স্থলাভিষিক্ত মনে করেন' (বাহরুর রায়েক ২য় খণ্ড। সূত্রঃ খুতবার ভাষা আহকাম ও মাসায়েল পৃষ্ঠা ১৭)।

উল্লিখিত মন্তব্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জুমুআ'র খুতবায় আরবী ভাষা ব্যবহার অপরিহার্য, যেমনটি নামাযে। কারণ- সায়্যিদিনা হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুতবাকে যেহেতু দু'রাকাত নামায সদৃশ গণ্য করা হয়েছে, তাহলে এটা ইবাদত। আর ইবাদত আরবী ভাষা ছাড়া হয় না।

১১. জুমুআর নামাযের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অভ্যাস ছিলো যে, যখন মসজিদে সমস্ত লোক একত্রিত হতেন ঠিক তখনই তিনি তাশরীফ নিতেন এবং উপস্থিত লোকদের সালাম দিতেন। অতঃপর হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু খুতবার আযান দিতেন। আযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা আরম্ভ করতেন।

মসজিদের মিম্বর তৈরী না হওয়া পর্যন্ত তিনি ধনুক বা লাঠির উপর ভর দিয়ে খুতবা দিতেন। কখনও কখনও মিহরাবের নিকটতম কাঠের খাম্বার সাথে হেলান দিয়ে তিনি খুতবা দিতেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই খুতবা দিতেন এবং দুই খুতবার মাঝে কিছু সময় বসতেন। ঐ সময় তিনি কোনো কথা বা কাজ করতেন না এবং কোনো দোয়াও পাঠ করতেন না। দ্বিতীয় খুতবা শেষ হলে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ইকামত বলতেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করতেন, (রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায ও মাসাআলা-মাসায়েল শিক্ষা, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪০)

১২. ইসলামী শরীয়তের অনেকগুলো বিষয়ের মতো খুতবাও যুক্তি-নির্ভর বিষয় নয়, বরং এর অবস্থান যুক্তির উর্দ্ধে। আর যুক্তির উর্দ্ধে অবস্থানরত বিষয়সমূহে বিশেষ কোনো প্রয়োজনেও রদবদল করা যায় না, (ইমদাদুল ফাতওয়াহ, হযরত আশরাফ আলী থানবী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ৪৪৬)।

১৩. ফিকাহ শাস্ত্রের প্রমাণ্য গ্রন্থরাজিতে খুতবা সংক্রান্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয় যে, প্রধান চার মাযহাবের সুস্পষ্ট মতামত হলো- আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা পাঠ করা মাকরূহ, নাজায়েয, সুন্নাহ বিরুদ্ধ এবং নিষিদ্ধ (কিতাবুল ফিকাহ আলাল মাজাহিরিল আরবা- আল্লামা জাযরী, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা- ৩৯১ এবং ইমদাদুল ফাতাওয়া খণ্ড-১ পৃষ্ঠা ৪৪২, সূত্রঃ- খুতবার ভাষা আহকাম ও মাসায়েল পৃষ্ঠা ১৯)

১৪. জুমুআ'র নামাযে খুতবা শর্ত। খুতবা ব্যতিরেকে জুমুআ আদায় হয় না। শুধুমাত্র যিকরুল্লাহ দ্বারাই উক্ত শর্ত আদায় হয়। (বাহরুর রায়েক, সূত্রঃ খোৎবাতুল আহকাম ভূমিকা অধ্যায়)

১৫. জুমুআ, ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার খুতবা আরবীতে পাঠ করা সুন্নাত। আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় খুতবা দেয়া বিদআত (নাজায়েয)। (মোছাফ্‌ফা শরহে মুয়াত্তা, কিতাবুল আযকার, দুররে মুখতার, শুরুতুচ্ছালাত শরহে এহইয়াইল উলূম। সূত্রঃ খোৎবাতুল আহকাম ভূমিকা অধ্যায়)

১৬. একইভাবে নামাযের পূর্বে খুতবার বিষয়বস্তু স্থানীয় (অন্য) ভাষায় তরজমা করে শুনানোও বিদআত। অবশ্য নামাযের পরে খুতবার বিষয়বস্তুর তরজমা শুনানো উত্তম। (খোৎবাতুল আহকাম ভূমিকা অধ্যায়)

১৭. অতিরিক্ত কয়েকটি শর্ত জুমুআর মধ্যে রয়েছে, যা অন্যান্য নামাযে

নেই। তন্মধ্যে দুটো খুতবা দেয়া এবং দু'খুতবার মাঝখানে বসা। প্রথম খুতবায় চারটি বিষয় থাকা ওয়াজিব। (১) আল্লাহর প্রশংসা করা এবং কমপক্ষে আলহামদু লিল্লাহ বলা, (২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করা, (৩) তাকওয়ার উপদেশ দেয়া এবং (৪) কুরআন পাক থেকে একটি আয়াত পাঠ করা। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় খুতবায়ও এ চারটি বিষয় ওয়াজিব, তবে শুধু আয়াত পাঠের জায়গায় দোয়া পাঠ করা ওয়াজিব। উভয় খুতবা শ্রবণ করাও ওয়াজিব। (এহইয়াউ উলূমিদ্দীন বঙ্গানুবাদ, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা- ৩২৮-৩২৯)

১৮. জুমুআর নামায আদায়ের শর্তাবলীর মাঝে খুতবা পাঠ করা অন্যতম শর্ত। খুতবা ছাড়া জুমুআর নামায আদায়া হয় না। (বাহরুর রায়েক, সূত্রঃ আল-খুতবাতুল ইয়াকুবিয়া পৃষ্ঠা ৪)

১৯. জুমুআ, ঈদুল ফিতব এবং ঈদুল আযহার খুতবা আরবী ভাষায় পাঠ করা সুন্নাত। আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা পাঠ করা বিদআত। (মুছাফ্ফা শরহে মুআত্তা- শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, কিতাবুল আযকার- ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, দুররুল মুখতার। সূত্রঃ আল-খুতবাতুল ইয়াকুবিয়া পৃষ্ঠা ৪)

২০. জুমুআ'র নামাযের পূর্বে আরবী খুতবার তরজমা স্থানীয় কিংবা অন্য ভাষায় শুনিয়ে দেয়া বিদআত। তবে জুমুআর নামাযের পরে খুতবার পরিবেশ থেকে পৃথক হয়ে খুতবার তরজমা বয়ান করা উত্তম। (মুছাফ্ফা, কিতাবুল আযকার, দুররুল মুখতার, শরহে এহইয়া লিজজুবাইদ। সূত্রঃ আল-খুতবাতুল ইয়াকুবিয়া পৃষ্ঠা ৪)

উপরোক্ত বিষয়গুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, জুমুআর খুতবা নিঃসন্দেহে একটি ইবাদত এবং ইবাদত কখনো আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় হয় না। অতএব এতোগুলি প্রমাণ ও ব্যাখ্যা

বিশ্লেষণের পরও যদি কেউ জুমুআর খুতবায় আরবী ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করে, তাহলে তাদেরকে 'বিদআতী' ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

মাযহাবের দৃষ্টিতে খুতবার ভাষা

মালিকী মাযহাবের সিদ্ধান্ত

মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম শাইখ ইবরাহীম আল-হোসাইনী আল-দাসুকী (মৃত্যু ৬৭৬ হিজরী) বলেন, "জুমুআ'র নামাযে উপস্থিত মুসল্লীদের কেউই যদি আরবী ভাষা না বুঝে, তবে খুতবা অবশ্যই আরবী ভাষায় দিতে হবে। উল্লিখিত পরিস্থিতিতে যদি একজন ব্যক্তিও বিশুদ্ধভাবে আরবী ভাষায় খুতবা পাঠ করতে না পারে, তবে ঐ সকল মুসল্লীগণের জন্যে শুধু যোহরের নামায আদায় করতে হবে। তাদের জন্যে জুমুআ'র নামায জরুরী নয়।" (তথ্যসূত্রঃ The Language of the Friday Khutbah. ইন্টারনেটে প্রকাশিত শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী'র লিখিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত- www.muftitaqiusmani.com)

মালিকী মাযহাবের আরেকটি প্রসিদ্ধ মাসাইল গ্রন্থ 'মিনহাযুল জলিল'-এ বলা হয়েছে, "জুমুআ'র মজলিসে উপস্থিত মুসল্লীগণ যদি অনারব এবং বোকাও হয়, তবুও জুমুআ'র দু'টি খুতবা নামাযের পূর্বে এবং আরবী ভাষায় স্বরব কণ্ঠে (উচ্চ স্বরে) দিতে হবে। এই উপস্থিতির মাঝে যদি কেউ আরবী ভাষায় খুতবা পাঠ করতে না পারে, তাহলে তাদের জন্যে জুমুআ'র নামায জরুরী নয়। তারা শুধু যোহরের নামায আদায় করবে।" (তথ্যসূত্রঃ The Language of the Friday Khutbah. ইন্টারনেটে প্রকাশিত শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী'র লিখিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত- www.muftitaqiusmani.com)

মালিকী মাযহাবের আরেক প্রসিদ্ধ ইমাম আল-হাত্তাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত জাওয়াহির আল-ইকলিল গ্রন্থে লিখেছেন, "ইমাম যদি জুমুআ'র নামাযের পরে খুতবা পাঠ করেন, তবে তার জন্যে জরুরী হবে সাথে সাথে (আবার) নামায আদায় করা। যেহেতু জুমুআ'র নামাযের সাথে খুতবার সম্পর্ক জড়িত, অতএব খুতবা পাঠ করার পরপরই নামায আদায় করা জরুরী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে নামায আদায় না করলে, খুতবা ও নামায দু'টোই আবার আদায় করতে হবে। এই কারণে খুতবা আরবী ভাষায় পাঠ করাও বিধান।" (তথ্যসূত্রঃ The Language of the Friday Khutbah. ইন্টারনেটে প্রকাশিত শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী'র লিখিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত- www.muftitaqiusmani.com)

একইভাবে মালিকী মাযহাবের আরেক প্রসিদ্ধ ইমাম আল-আদাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "শ্রোতাদের উপর নির্ভর করে জুমুআ'র খুতবা নয়! জুমুআ'র খুতবা আরবী ভাষায় হতেই হবে। যদি ইমাম আরবী ভাষায় খুতবা পাঠ করতে না পারেন, তাহলে ঐসকল মুসল্লীদের জন্যে জুমুআ'র নামায জরুরী নয়। শুধু যোহর নামায আদায় করলেই চলবে।" (তথ্যসূত্রঃ The Language of the Friday Khutbah. ইন্টারনেটে প্রকাশিত শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী'র লিখিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত- www.muftitaqiusmani.com)

শাফিঈ মাযহাবের সিদ্ধান্ত

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শাফিঈ মাযহাবের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-মাজমু'-এ লিখেছেন, 'অধিকাংশ আলিমের পাকাপোক্ত অভিমত- খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া উচিত। কেননা খুতবা হলো এক ফরয যিক্র। সুতরাং তা আরবী ভাষার সাথে শর্তযুক্ত। (আল মাজমু খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ২১)

'শাফিঈ মাযহাবের অন্যতম বিশিষ্ট মুফতী ইমাম আল-রামলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মালিকী মাযহাবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলেন, 'এটাই নিয়ম যে, খুতবা দিতে হবে আরবী ভাষায়। কারণ এটা সাহাবায়ে কিরামদের অনুসরণ করার অন্যতম পন্থা, যা মুমিনের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এ ছাড়াও খুতবাদানের জন্য আরবী শিখতে হবে। যেহেতু খুতবাদান ফরয-ই-কিফায়া। সুতরাং অন্তত একজন লোককেও খুতবা পাঠ করার মতো আরবী শিখতেই হবে। যদি এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, আরবী ভাষায় কেউ খুতবা দান করতে পারে না, তাহলে ঐ সকল মুসল্লীগণ শুধু যোহরের নামায আদায় করবেন। তাদের জন্য জুমুআর নামায জরুরী নয়।'

(তথ্যসূত্রঃ The Language of the Friday Khutbah. ইন্টারনেটে প্রকাশিত শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী'র লিখিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত- www.muftitaqiusmani.com)

হাম্বলী মাযহাবের সিদ্ধান্ত

উপরোল্লিখিত দুই মাযহাবের মতো হাম্বলী মাযহাবেরও সিদ্ধান্ত এটাই যে, খুতবাদানকারী ব্যক্তি যদি একেবারেই আরবী পাঠ করতে পারে না, সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঐ দিনের জন্য অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, খুতবার ভাষা কখনো শ্রোতাদের শুধু বুঝার বিষয় নয়, এটা শোনার বিষয়। তাই শ্রোতাগণ বুঝোক আর না বুঝোক খুতবা আরবী ভাষায়ই দিতে হবে।

হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম ইমাম আল্লামা বোহুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় খুতবা পাঠ করা বৈধ নয়, যদি খুতবা পাঠকারী আরবী ভাষা মোটেই পড়তে না পারে তবে অন্য ভাষায় দিতে পারবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, খুতবা কখনো আরবী ভাষা ছাড়া সঠিক উচ্চারণ সম্ভব নয় এবং এটা পবিত্র কুরআনের অংশ বিশেষ, ফলে

খুতবার ভাষা হতে হবে একমাত্র আরবী।" (তথ্যসূত্রঃ The Language of the Friday Khutbah. ইন্টারনেটে প্রকাশিত শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী'র লিখিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত- www.muftitaqiusmani.com)

হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত

হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম আবূ ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ছাহেবাইন), আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা এবং নামাযের সূরা কিরাত ও দোয়া দরূদ পাঠ করা নাজায়েয (মাকরূহ তাহরিমী) সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষায় খুতবা পাঠকে মাকরূহ মনে করেন। (ফাতাওয়া শামী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৫৭ এবং ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ খণ্ড -৫, পৃষ্ঠা ৯০)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শরীয়তের পরিভাষায় মাকরূহ বিষয়ের উপর অটল থাকা নাজায়েয এবং ক্ষেত্র বিশেষে হারাম।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী লিখেছেন, "অন্যান্য মাযহাবের মতো হানাফী মাযহাবের ইমামগণও জুমুআ'র খুতবায় ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ ইমাম আবূ ইউসূফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মনে করেন, 'বিশেষ করে জুমুআ'র খুতবা শ্রোতাদের বুঝার ব্যাপার নয়। এটা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যিক্‌র, যা নিরব মনযোগ সহকারে শুনতে হয়। তাতেই যিকির শোনার হক বা দায়িত্ব আদায় হয়। ফলে যিকির আরবী ভাষায় হওয়া জরুরী।'

তিনি আরো লিখেছেন, "ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র সিদ্ধান্ত হলো, আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় জুমুআ'র খুতবা

দেওয়া মাকরূহ্। তবে কেউ যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে অন্য কোনো ভাষায় খুতবা দান করে, তাহলে জুমুআ'র নামায আদায় হয়ে যাবে। এতে সুস্পষ্ট যে, শুধুমাত্র একবার যদি কেউ এরকম করে তাহলে তার খুতবা ও নামায আদায় হবে। কিন্তু নিয়মিত আমল করা জায়েয নয়।

কোনো কোনো লেখক বলেছেন যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জুমুআ'র খুতবায় ভাষা ব্যবহার সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভিন্ন মন্তব্যের কারণে পরবর্তীতে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন। আসলে বিষয়টি মূলত এরকম নয়। এখানে বিষয় হচ্ছে দু'টো।

প্রথমতঃ নামাযে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় করা যাবে কি-না?

দ্বিতীয়তঃ জুমুআ'র খুতবায় আরবী ভাষার ব্যবহার?

ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রথমে মনে করেছিলেন যে, বিশেষ কারণে নামাযে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় করা যেতে পারে। কিন্তু উলামায়ে কেরামের আবিষ্কৃত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তিনি পরবর্তীতে তাঁর এই সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসেন। এমনকি সকলের মতো তিনিও নামাযে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় নিষিদ্ধ (বা হারাম) ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে খুতবায় আরবী ভাষার ব্যবহার। এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত বরাবরই এক। অর্থাৎ ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র মতে জুমুআ'র খুতবায় আরবী ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করা মাকরূহ্। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় জুমুআ'র খুতবা 'মাকরূহ তাহরিমী'। অর্থাৎ আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা প্রদান করলে জুমুআ আদায় হবে না। তাঁদের (ছাহেবাইন) সাথে ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র এটাই মতপার্থক্য।" (রাদ্দুল মুহতার, সূত্রঃ The

Language of the Friday Khutbah. ইন্টারনেটে প্রকাশিত শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী'র লিখিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত- www.muftitaqiusmani.com)

ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র উপরোক্ত প্রথম সিদ্ধান্তকে সামনে নিয়েই একদল লা-মাযহাবী চিৎকার করেন। কিন্তু ইমাম আযমের পরবর্তী সিদ্ধান্তকে তারা এড়িয়ে যান। এমনকি কিছু সংখ্যক বিরুদ্ধবাদীরা উক্ত সব কারণে ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে 'যুক্তিনির্ভর' মুজতাহিদ মনে করেন। অথচ ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক আবিষ্কৃত ৮৩ হাজার, ৬ লক্ষ, আবার কারো কারো মতে ১২ লক্ষ মাসআলার মধ্যে একটিও যুক্তিনির্ভর নয়। সবগুলোর সাথে কুরআন-হাদীসের নির্দেশ জড়িত। তারপরও তিনি নিজেই বলেছেন, "আমার কোনো ফাতাওয়া যখন সহীহ হাদীস দ্বারা ভুল প্রমাণিত হবে, সাথে সাথে সহীহটা গ্রহণ করা উচিত।"

উলামায়ে কিরামের অভিমত

১. শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী লিখেছেন, "নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দেশ ও গোত্রে তাদের নিজস্ব ভাষায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্যে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। এ কাজের জন্যে তিনি সর্বদাই সাহাবায়ে কিরামদের বিভিন্ন দেশে পাঠাতেন। সায়্যিদিনা হযরত যাইদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি সিরিয়া প্রেরণ করেন। হযরত যাইদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ায় অবস্থান করে সিরিয়ানদের ভাষা শিখেছেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্যনীয় ব্যাপার যে, এভাবে সাহাবায়ে কিরাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন, অবস্থান

করেছেন, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করেছেন, বিভিন্ন ভাষায় ইসালামের দাওয়াত দিয়েছেন। অথচ জুমুআর খুতবায় তারা কখনো আরবী ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করেননি।" (সূত্রঃ The Language of the Friday Khutbah. ইন্টারনেটে প্রকাশিত শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী লিখিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত- www.muftitaqiusmani.com)

২. উপমহাদেশের যুগ শ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন, ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মুছাফ্ফা শরহে মুয়াত্তা' গ্রন্থে লিখেছেন, "এ কারণেও আরবী ভাষায় খুতবা হওয়া দরকার যে, পূর্ব ও পশ্চিমের সমগ্র মুসলিম উম্মায় সদা এ নিয়মেই তা প্রচলিত ছিলো। অথচ অনেক দেশে শ্রোতামণ্ডলী ছিলো আজমী।" (মুছাফফা খণ্ড-১ পৃষ্ঠা ১৫৪) উল্লেখ্য যে, দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে ভারত উপমহাদেশে সর্ব প্রথম পবিত্র কুরআনের ফার্সী অনুবাদ করেছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। জুমুআ'র খুতবায় অন্য ভাষা ব্যবহার করার সমর্থন থাকলে নিশ্চয়ই তিনি ফার্সী কিংবা উর্দু ভাষায় অনুবাদ করতেন কিংবা অনুমতি দিতেন।

৩. হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "জুমুআ'র খুতবায় আরবী ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করা মাকরূহ।" (ফাতাওয়া রশীদিয়া পৃষ্ঠা ৪৩০)

৪. হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন, "হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরবী ভাষায় খুতবা দানের ধারাবাহিকতা স্পষ্ট এবং খুতবার ভাষা আরবী হওয়াই যে মুখ্য, তা আজমী দেশসমূহে সাহাবায়ে কেরামের ভিন্ন ভাষায় খুতবা না পড়া থেকে প্রমাণিত। অথচ বেশ কিছু সাহাবী ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন এবং সে যুগে দ্বীনি তালিমের

প্রয়োজনও ছিলো বেশি। তবুও যখন আরবী ভাষায় খুতবা প্রদানের ধারাবাহিকতা স্পষ্ট এবং খুতবার ভাষা আরবী হওয়াই মুখ্য হলো, তখন তা সুন্নাতে মুআক্কাদা সাব্যস্ত হলো। সুতরাং ফিকাহশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় সুন্নাতে মুআক্কাদা ত্যাগ করা ফাছিকীর কারণ অর্থাৎ মাকরূহ তাহরিমী।" (ইমদাদুল ফাতাওয়া খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৪৪২-৪৪৮)

হযরত থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্যস্থানে লিখেছেন, "কতিপয় ইমামগণের মতে যে আমলে ধারাবাহিকতা কোনোক্রমেই ক্ষুন্ন হতে দেখা যায় না, তা ওয়াজিব হওয়ার জন্য দলীল বহন করে। যেমন একই দলীলের ভিত্তিতে হিদায়া গ্রন্থে ঈদের নামাযকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব জুমুআ'র নামাযের আগে আরবী ভাষায় খুতবাদান ওয়াজিব হওয়ার জন্যেও যথেষ্ট। (ইমদাদুল ফাতাওয়া খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৪৪২-৪৪৮)

৫. আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "আরবী ভাষায় জুমুআ'র খুতবা পাঠ করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। অতএব উসূলে ফিকাহ্ অনুযায়ী সুন্নাতে মুয়াক্কাদার পরিপন্থী কাজ বিদআত কিংবা মাকরূহ তাহরিমী। (মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৬১-৩৬২)

৬. মুফতিয়ে আজম হযরত মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "জুমুআ ও ঈদের খুতবা সম্পর্কে ধারাবাহিক সুন্নাত হলো আরবী ভাষায় হওয়া। ইসলামের প্রথম যুগে দ্বীনে ইসলামের শিক্ষাদান ও দাওয়াতের একান্ত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও খুতবার ক্ষেত্রে আরবী ভাষাকে ত্যাগ করা হয়নি।' তিনি অন্যত্র বলেন, 'ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র মতে খুতবার ভাষা আরবী হওয়া শর্ত। অন্য ভাষায় খুতবা পাঠ শুদ্ধ নয়। খুতবা শুদ্ধ না হলে জুমুআ'র নামাযও শুদ্ধ হবে না।" (কিফায়াতুল মুফতী খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা ২২২-২২৩)

৭. দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতী হযরত মাওলানা আজিজুর রাহমান উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "আমাদের পূর্বসূরী ইমাম ও আলিমগণ থেকে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা পাঠ করার প্রমাণ নেই। এ কারণে দায়িত্বশীল উলামায়ে কিরাম অন্য ভাষায় খুতবা পাঠ করাকে মাকরূহ ও বিদআত বলেছেন।" (ফাতাওয়া দারুল উলূম খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা- ২৫)

৮. শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় খুতবা দানকে সুন্নাত বিরোধী মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। (তাহকীকুল খুতবা, পৃষ্ঠা ৮২)

৯. হযরত মাওলানা ইছহাক বর্দ্ধমানী লিখেছেন, "খুতবা বাদশাহর পরওয়ানা স্বরূপ। তাহা বাদশাহর ভাষায় অবতরণ হয়। বাদশাহর দরবারে তাঁহার ভাষা ব্যতীত তাঁহার শত্রুর ভাষা ব্যবহার করা মূর্খ ও নির্লজ্জের কাজ। খুতবা নামাজের অর্ধাঙ্গ। সুতরাং ইহা অনারবী ভাষায় পাঠ করা অবৈধ কর্ম। বাদশাহ এ স্থলে আল্লাহ্‌কেই বুঝানো হয়েছে।" (বাংলা ভাষায় খুতবা পড়িব না কেন? পৃষ্ঠা ৩৬)

১০. হযরত মাওলানা মুফতী শাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মিত আমল দ্বারা অনেকগুলো কাজ যেমন সুন্নাত সাব্যস্ত হয়েছে, তেমনি আরবী ভাষায় খুতবা পাঠও, অন্য ভাষায় নয়। যেহেতু ভিন্ন ভাষায় খুতবা পাঠ করার উদাহরণ হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবনে এক বারের জন্যেও রেখে যাননি। এমনকি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এই ইতিহাস পাওয়া যায় না, যদিও সাহাবীদের অনেকেই ভিন্নভাষী ছিলেন।" (জাওয়াহিরুল ফিকাহ্‌ খণ্ড-১)

১১. হযরত মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন,

"হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়ী, মুজতাহিদ ইমামগণ থেকে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দানের প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদিও তৎকালে জুমুআ'র নামাযে বহুল পরিমাণে অনারবী লোকের সমাবেশ হতো। আরব ভূখণ্ডের বাইরের দেশগুলো বিজিত হওয়ার পর সর্বত্র জুমুআর জামাআতের আয়োজন হয়েছিলো। কিন্তু কোথাও আরবী ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় খুতবা দান কিংবা আরবী খুতবার অনুবাদ পাঠ করার নজীর দেখা যায় না। মোট কথা, আরবী খুতবা পাঠ করা সুন্নাত। অন্য ভাষায় খুতবা দান বা আরবী খুতবার অনুবাদ পাঠ করা মাকরূহ।" (মজমুয়ায়ে খুতবাতে মাছুরা পৃষ্ঠা-৪৮)

জুমুআ'র খুতবার মাসাইল

- জুমুআ'র খুতবা (জুমুআ'র) নামাযের শর্ত। সুতরাং খুতবা ছাড়া জুমুআ'র নামায পূর্ণ হয় না। (বাহরুর রায়েক খণ্ড-২)
- খুতবার মধ্যে ফরয দু'টি। এক- জুমুআ'র ওয়াক্ত। অর্থাৎ সূর্য পশ্চিমে ঢলার আগে খুতবা শুদ্ধ হবে না। দুই- যিকরুল্লাহ। ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র মতে তা যে কোনো শব্দে হোক, সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ উভয় হতে পারে। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র মতে খুতবা দীর্ঘ আবশ্যক, যাকে খুতবা বলা যেতে পারে। খুতবায় উপরোক্ত দু'টো কাজ ছাড়া বাকী সবগুলোই সুন্নাত এবং মুস্তাহাব। (হিদায়া খণ্ড-১/ বাহরুর রায়েক খণ্ড-২)
- জুমুআ ও ঈদের খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ভিন্ন

ভাষায় বিদআত ও নিষিদ্ধ। (মুছাফফা- শরহে মুয়াত্তা, শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ / আল মাজমু'- ইমাম নববী / ইমদাদুল ফাতাওয়া- হযরত থানবী / ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ)

- আরবী ভাষায় পঠিত বা পঠিতব্য খুতবা, খুতবার আযানের আগে অথবা নামাযের পরে অন্য ভাষায় তরজমা পাঠ করা যায়, তবে খুতবা ও অনুবাদের মাঝে তারতম্য রাখা উচিত। এই কাজকে জরুরী মনে করা সঠিক নয়। একই সাথে খুতবার তরজমা অন্যস্থানে দাঁড়িয়ে বা বসে করা উচিত। (ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ, জাওয়াহিরুল ফিকাহ। ইমদাদুল ফাতাওয়া খণ্ড- ১ পৃষ্ঠা ৪৩৮)

- অজুর সাথে খুতবা পাঠ করা সুন্নাত। বিনা অজুতে মাকরূহ্। (বাহরুর রায়েক খণ্ড-২)

- খুতবা দাঁড়িয়ে পড়া সুন্নাত। বসে পড়া মাকরূহ। (আলমগীরি খণ্ড-১/ বাহরুর রায়েক/জাওয়াহিরুল ফিকাহ)

- খুতবার শুরুতে অনুচ্চস্বরে 'আউযুবিল্লাহী মিনাশ-শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়া সুন্নাত। উচ্চস্বরে পড়া সুন্নাতের অমান্যতা। (ফাতাওয়া শামী/ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ খণ্ড-৫ পৃষ্ঠা ১১২)

- মুসল্লীদের সামনে নিয়ে খুতবা পড়া সুন্নাত। কাবা শরীফ কিংবা অন্য কোনো দিকে মুখ করে খুতবা পড়া মাকরূহ। (আলমগীরি/বাহরুর রায়েক)

- মুসল্লীরা যাতে শুনতে পায়, সেভাবে উচ্চস্বরে খুতবা পড়া সুন্নাত। আস্তে পড়া মাকরূহ। (আলমগীরি/বাহরুর রায়েক)

- খুতবা পাঠে দশটি বিষয়ের সমন্বয় থাকা সুন্নাত। ১. আলহামদুলিল্লাহ্'র

সাথে শুরু করা। ২. আল্লাহর প্রশংসা করা। ৩. কলিমায়ে শাহাদাত পাঠ করা। ৪. দুরুদ শরীফ পাঠ করা। ৫. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি বাক্য পাঠ করা। ৬. কুরআন শরীফের কোনো আয়াত পাঠ করা। ৭. উভয় খুতবার মধ্যখানে তিন তসবীহ পরিমাণ সময় বসা। ৮. সকল মুসলমানদের জন্য দুআ করা। ৯. দ্বিতীয় খুতবায় পুনরায় হামদ্ ও সানা এবং দরুদ পাঠ করা। ১০. উভয় খুতবাকে সংক্ষেপ করা। অর্থাৎ তিলাওয়াতে মুফাস্সালের কোনো সূরার সমান পাঠ করা, এর চেয়ে দীর্ঘ করা মাকরূহ। (আলমগীরি/ জাওয়াহিরুল ফিকাহ্)

- মুসল্লীদের জন্যে খুতবা শুনা ওয়াজিব। তাই খুতবা চলা কালে আলাপ-আলোচনা, পাখা চালিয়ে মনযোগ বিনষ্ট করা, আতর ব্যবহার, ঘড়িতে চাবি দেওয়া, খাওয়া-দাওয়া, তাসবীহ পাঠ, সালামের জবার দান এবং নামায আদায় ইত্যাদি কাজ যা খুতবা শুনতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তা সবই নিষিদ্ধ। খুতবায় হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক পাঠ করলে, খতীব দুরুদ শরীফ পাঠ করবেন। তবে শ্রোতাগণ মনে মনে দুরুদ পাঠ করবে। ঈদের খুতবায় ইমাম যখন তাকবীর পড়বেন, শ্রোতাগণও তখন মনে মনে তাকবীর পড়বে। তবে অবশ্যই উচ্চস্বরে নয়। (শামী/ আলমগীরি/ ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ)

- অধিকতর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে জুমুআর দ্বিতীয় আযানের জবাব দান করা মাকরূহ। তবে মনে মনে জবাব দেওয়া যায়। অনুরূপ, দ্বিতীয় আযান শুনে উসীলার দোয়া পাঠ করা এবং হাত তুলে দোয়া করাও নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- 'ইমাম যখন খুতবার জন্য বের হয়ে আসেন, তখন কোনো নামায নেই, কোনো কথাও নেই।' (শামী ১ম খণ্ড / ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ/ আহসানুল ফাতাওয়া)

- খুতবা চলাকালে যেমন নামায, দুরুদ পাঠ ও তাসবীহ-তাহলীল হাদীস

মতে নিষিদ্ধ, তেমনি মসজিদ-মাদরাসার জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (ফাতাওয়া শামী/ ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ)

- জুমুআ'র খুতবা শুরু করার আগে খতীব সাহেবকে কিছুক্ষণ মিম্বরে বসা সুন্নাত। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআ'র দিন খুতবা দানের আগে মিম্বরে আরোহণ করে কিছুক্ষণ বসতেন। (মুসনাদে ইমাম আযম আবূ হানীফা পৃষ্ঠা -৮৩/ আলমগীরি খন্ড-১ পৃষ্ঠা ১১৮)

- সায়্যিদিনা আবূ যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা পাঠ করছিলেন, তখন আমি উবাই ইবনে কা'বকে প্রশ্ন করলাম, এ সূরা কখন নাযিল হয়েছিলো। হযরত উবাই (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন, 'যাও! তোমার জুমুআ নেই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেন, উবাই ঠিক বলেছে।" (আল-খুতবাতুল ইয়াকুবিয়া-৯)

- খুতবা মুখস্ত পাঠ করা মুস্তাহাব। তবে কিতাব দেখে পড়লে অসুবিধা নেই। (ইমদাদুল ফাতাওয়া খণ্ড-১)

- জুমআ ও ঈদের খুতবাদাতা (বা খতীব) এবং ইমাম একই ব্যক্তি হওয়া উত্তম। তবে খতীবের অনুমতিক্রমে অন্য জন ইমামতি করতে পারে। (দুররে মুখতার খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-৭৭১/ইমদাদুল ফাতাওয়া/ ফাতাওয়া দারুল উলূম খণ্ড ৫, পৃঃ ৭১)

- খুতবা দানকারী ব্যতীত অন্য কেউ জুমুআর নামায পড়ালে তাঁকে খুতবা চলাকালে কিছু অংশ হলেও উপস্থিত থাকতে হবে। (বাহরুর রায়েক খণ্ড-২/ আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড-৪)

- মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া সুন্নাত। তথাপি কেউ নীচে দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠ করলে সুন্নাতের খেলাফ করা হবে। তবে এতে খুতবা ও নামায আদায় হয়ে যাবে। মিহরাবের বাম পাশে মিম্বর হওয়াও সুন্নাত। হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বর তিন স্তর বিশিষ্ট ছিলো। অবশ্য খতীব যেকোনো স্তরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে পারেন। এতে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। (তবে সর্বোচ্চ স্তরে বসা ও দ্বিতীয় স্তরে দাঁড়িয়ে খুতবা দান উত্তম।) (ফাতাওয়া শামী, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা ৭৭০/ ফাতাওয়া দারুল উলূম, খণ্ড-৫ পৃষ্ঠা ১২৭)

- জুমুআর দ্বিতীয় আযান মসজিদের ভেতর মিম্বরের নিকটে খতীবের সামনে হওয়া সুন্নাত। আরব ও আজমের সর্বত্র শুরু থেকে এ পর্যন্ত এই প্রথাই চালু রয়েছে। ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাবগুলোতে জুমুআর দ্বিতীয় আযান সম্পর্কে عند النبر (মিম্বরের নিকটে بين يدى احطي খতীবের সামনে) বাক্য থেকে সে কথাই স্পষ্ট হয়। (হিদায়া খণ্ড-১ পৃঃ ১৫১ / কিফায় খণ্ড ২ পৃঃ ৩৮ / আল মাবছুত- ইমাম সরখছী, খণ্ড-১ পৃঃ ১৩৪ / ইমদাদুল ফাতাওয়া খণ্ড-১ পৃঃ ৪৭৯/ ফাতাওয়া দারুল উলূম, খণ্ড-৫ পৃঃ ১২০ / আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড-৪)

- রমযানের শেষ জুমুআয় 'আল্‌বিদা' 'আলবিদা' 'আলফিরাক' 'আলফিরাক' ইত্যাদি শব্দে শোক প্রকাশ করা হাদীস ও পূর্বসূরীগণের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়। সুতরাং এ ধরণের খুতবা পাঠ করা অনুচিত। (ইদাদুল ফাতাওয়া / ফাতাওয়া দারুল উলূম, খণ্ড-৫)

- খুতবার বিষয়বস্তু নির্ধারণে প্রত্যেক যুগে আহলে সুন্নাত ওয়ালা জামাতের মতাদর্শ সংরক্ষণের ব্যবস্থা চলে আসছে। সে মতে বর্তমান যুগে শিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অপরাপর সাহাবায়ে কিরামগণের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার প্রতিকার উদ্দেশ্যে খুতবায় তাঁদের মর্যাদা বর্ণনা এবং তাঁদের জন্যে দোয়া করা

আবশ্যক। (আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড-৪) উল্লেখ্য যে, শিয়া সম্প্রদায় তাদের জুমুআর খুতবায় হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অপরাপর সাহাবায়ে কিরামগণের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে থাকে।

- খুতবা দান কালে খুতবা শোনা ও চুপ থাকার যে নির্দেশ, তা অধিকতর বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে দূরের ও কাছের প্রত্যেক মুসল্লীর জন্যে আবশ্যকীয়। (বাদায়ে, খণ্ড-১ পৃঃ ২৬৪ / আলমগীরি খণ্ড-১ পৃঃ ১১৯ সূত্রঃ খুতবার ভাষা আহকাম ও মাছায়েল পৃঃ ৩১)

- খতীব যদি একা হন এবং শুধু মহিলাদের উদ্দেশ্যে খুতবা পাঠ করেন, তবে খুতবা আদায় হবে না। কারণ- খুতবা আদায়ের জন্যে খতীবের সামনে কমপক্ষে তিনজন পুরুষের উপস্থিতি আবশ্যক, যাদের দ্বারা জুমুআর নামায শুদ্ধ হয়। (শামী খণ্ড-১ / আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড - ৪)

- কতিপয় বধির বা ঘুমন্ত লোকের সামনে খুতবা দিলেও খুতবা আদায় হয়। (ফতহুল কাদীর খণ্ড-১ পৃঃ ৪১৩)

- খুতবা পাঠ কালে মুসল্লীগণের যেকোনো ভাবে বসা জায়েয আছে। তবে নামাযে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়াতু) পাঠের মতো বসা মুস্তাহাব। (ফাতাওয়া দারুল উলূম খণ্ড-৫ / আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড-৪)

- খুতবা পাঠ কালে লাঠি হাতে নেয়া সম্পর্কে কিতাবে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে। তবে প্রয়োজনে লাঠি হাতে নিতে অসুবিধা নেই। অবশ্য অভ্যাসে পরিণত করা কিংবা খুতবা অনুষ্ঠানের অংশ মনে করা সঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ। (ইমদাদুল ফাতাওয়া খণ্ড-১ পৃঃ ৪৪১ / ফাতাওয়া দারুল উলূম খণ্ড-৫ পৃঃ ৬৬ / আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড-৪ পৃঃ ১৪৩)

- খুতবা দানের আগে মিহরাবে খতীব সাহেবের নামায পড়া মাকরূহ।

(শামী খণ্ড-১ পৃঃ ৭৬০ / বাহরুর রায়েক খণ্ড-২ পৃঃ ১৪৯)

- খুতবা পাঠ কালে মুসল্লীগণের নিদ্রা বা তন্দ্রাবিভোর হওয়া মাকরূহ। তন্দ্রা পেলে স্থান পরিবর্তন করা আব্যশক। (তিরমিযী শরীফ / ফাতাওয়া শামী খণ্ড-১, সূত্রঃ খুতবার ভাষা আহকাম ও মাসায়েল পৃঃ ৩১)
- খুতবা শুরু করার আগে মুসল্লীদের সুন্নাত নামায শেষ হবার জন্য খতীবের অপেক্ষা করা আবশ্যক নয়। খতীব সঠিক সময়ে খুতবা শুরু করতে পারেন। (ফাতাওয়া দারুল উলূম খণ্ড-৫ পৃঃ৭৬)
- মসজিদের দরোজায় খুতবা পাঠ করা সুন্নাতের খেলাফ। কারণ, মুসল্লীগণ খতীবের সামনে থাকবে- এটাই শরীয়তের বিধান। অনুরূপ, মুসল্লীগণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়াও মাকরূহ। (ফাতাওয়া দারুল উলূম খণ্ড-৫ পৃঃ ৯৯ / এমদাদুল আহকাম খণ্ড-১ পৃঃ ৬৫৩)
- জুমুআ ও দু'ঈদের খুতবায় ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনায়কের নাম উল্লেখ করে তাঁর উন্নতি এবং শত্রুদের পরাভুত হবার জন্যে দোয়া করা জায়েয বরং মুস্তাহাব (ফাতাওয়া দারুল উলূম খণ্ড-৫ পৃঃ ৯৪)
- খুতবা দানকালে খতীবকে টাকা পয়সা দেয়া বা সংগ্রহ করা জায়েয নয়। (ফাতাওয়া দারুল উলূম খণ্ড-৫ পৃঃ ১৩৫)
- প্রথম খুতবার পর খতীবের বসাবস্থায় খতীব ও মুসল্লীদরে পক্ষে হাত তুলে দোয়া করা মাকরূহ তাহরিমী। অবশ্য হাত না তুলে মনে মনে দোয়া করা জায়েয আছে। (বেহেশতী গাওহর পৃঃ ৮২/ ফাতাওয়া দুারুল উলূম খণ্ড-৫ পৃঃ ১৫৭)
- প্রত্যেক মাসে খুতবা পৃথক পৃথক হওয়া জরুরী নয়। (ফাতাওয়া দারুল উলূম খণ্ড-৫ পৃঃ ১৩৯)

- দ্বিতীয় খুতবায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী, বংশধর, পরিবারবর্গ বিশেষতঃ তাঁর দু'চাচাজান হযরত হামজা ও হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এবং চার মহান খলীফা রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা মুস্তাহাব। (বাহরুর রায়েক খণ্ড-২ পৃঃ ১৪৮/ দুররে মুখতার খণ্ড-১ পৃঃ ৭৫৯ / ফাতাওয়া দারুল উলূম খণ্ড-৫ পৃঃ ৫৩)

- খুতবা ও নামাযের মধ্যে যথেষ্ট সময় বিরতি ঘটলে খুতবা পুনরায় পাঠ করা আবশ্যক। (বাহরুর রায়েক খণ্ড-২ পৃঃ ১৪৭ / আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড-৪ পৃঃ ১১২)

- খুতবা পাঠকালে খতীব মুসল্লীগণের কোনো অসঙ্গত আচরণকে মুখে বারণ করতে পারেন। কিন্তু মুসল্লীগণ একে অন্যকে শুধুমাত্র ইশারা ইঙ্গিত করবেন- স্বশব্দে নয়। (আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড-৪ পৃঃ ১১৮)

- খুতবা পাঠ শুদ্ধ হওয়ার জন্যে খতীবের জুমুআ ফরজ হওয়া জরুরী নয়। (আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড-৪ পৃঃ ১২৮)

- কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে খুতবা দেয়াও জরুরী নয়। সুতরাং খতীব যদি আটকে যান, তবে প্রাসঙ্গিক না হলেও অন্য কিছু পড়তে পারেন। তবুও মুসল্লীগণ চুপ থাকবেন, খতীবকে খুতবা স্মরণ করিয়ে দিতে পারবেন না। খুতবা চলাকালে মুসল্লীগণের চুপ থাকা শর্ত। (আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড-৪ পৃঃ ১৪১)

- মিম্বর যদি মিহরাবে নির্মিত হয়, তবে সে মিম্বরে জুমুআ'র খুতবা দেয়া জায়েয আছে। (এমদাদুল আহকাম খণ্ড-১ পৃঃ৬৮১)

- মিম্বরে আরোহণ করে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে খতীবের সালাম প্রদান হানাফী মাযহাব মতে সুন্নাত পরিপন্থী। কোনো কোনো হানাফী আলিম এইভাবে সালাম প্রদানকে জায়েয মনে করেন, তা সঠিক নয়।

(এমদাদুল ফাতাওয়া খণ্ড-১ পৃঃ ৪০৯ / শামী খণ্ড-১ পৃঃ ৫৯৯ / বাহরুর রায়েক খণ্ড-২ পৃঃ ১৪৮)

- জুমুআ'র খুতবা পাঠের পর খতীবের যদি স্মরণে আসে যে, তাঁর ফজরের নামায আদায় করা হয়নি, তবে খুতবা শুদ্ধ হবে। কিন্তু তিনি ছাহেবে তরতীব (পাশাপাশি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্রমধারা বিঘ্নিত)- হলে নামাজের ইমামতী করবেন না। কিন্তু ঈদের খুতবা দানের পর কথাটি স্মরণ হলে উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ তিনি এ অবস্থায় ঈদের ইমামাতি করতে পারেন। (ইমদাদুল ফাতাওয়া খণ্ড-১ পৃঃ ৪২৬ / বাহরুর রায়েক খণ্ড-২ পৃঃ ১৪৭)

- মুসল্লীদের নামাযে থাকাবস্থায় যদি খুতবা শুরু হয়ে যায়, এতে নামায যদি সুন্নাত-মুয়াক্কাদা হয়, তাহলে নামায যথারীতি শেষ করতে হবে। কিন্তু নামায যদি নফল হয় তাহলে চার রাকাতের পরিবর্তে দু'রাকাত আদায় করেই খুতবা শুনতে হবে। (আলমগীরি খণ্ড-১ পৃঃ ১১৯ / বেহেশতী গাওহার পৃঃ ৮২)

- ইমাম খুতবার জন্যে দাঁড়ালে মুসল্লীদের নামায পড়া ও কথা বলা মাকরূহ তাহরীমি। তবে ছাহেবে তরতীবের জন্যে এ সময় কাযা নামায আদায় করা জায়েয, বরং ঐদিনের কাযা নামায আগে আদায় করা ওয়াজিব। (বেহেশতী গাওহার পৃঃ ৮১)

- খুতবা প্রদান কালে ডান ও বাম দিকে খতীবের মুখ ফিরানো বিদআত। এতে মুসল্লীগণের সামনে রাখার শরীয়ত বিধানে বিঘ্ন ঘটে। (শামী খণ্ড-১ পৃঃ ৭৫৯)

- দু'খুতবার মাঝখানে তিন বার 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করা যায় এই পরিমাণ সময় বসা মুস্তাহাব। (বেহেশতী গাওহার পৃঃ ৮১)

ঈদের খুতবার মাসাইল

- জুমুআ ও ঈদের খুতবার নির্দেশ প্রায় একই। পার্থক্য এতোটুকু যে, ঈদের খুতবা ফরজ নয়, বরং সুন্নাত। তাই খুতবা ছাড়াও ঈদের নামায হয়ে যায়। অবশ্য এতে সুন্নাত তরকের গোনাহ হয়। তবে ঈদের খুতবা পাঠ করা হলে তা শুনা ওয়াজিব। দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, ঈদের খুতবা নামাযের পরে পড়া হয়। (ফাতাওয়া শামী খণ্ড-১ সূত্রঃ খুতবার ভাষা আহকাম ও মাসাইল পৃঃ ৩৪)

- ঈদের প্রথম খুতবার শুরুতে দাঁড়িয়ে লাগাতার ৯ বার 'আল্লাহু আকবার' বলে খুতবা আরম্ভ করা এবং দ্বিতীয় খুতবার শরুতেও লাগাতার ৭ বার উক্ত তাকবীর বলা খতীবের জন্যে মুস্তাহাব। (ফাতাওয়া শামী খণ্ড-১৭৮৩ / আলমগীরি খণ্ড-১ পৃঃ ১২১ / বাহরুর রায়েক খণ্ড-২ পৃঃ ১৬২) উল্লেখ্য যে, খুতবা শুরুর এই তাকবীরগুলো তাকবীরে তাশরীকের শামিল নয়।

- অনুরূপ ঈদের দ্বিতীয় খুতবার শেষে খতীবকে মিম্বর থেকে নামার আগে একাধারে ১৪ বার 'আল্লাহু আকবার' বলা মুস্তাহাব। (বাহরুর রায়েক খণ্ড-২ পৃঃ ১৬২ / দুররে মুখতার খণ্ড-১ পৃঃ ৭৮৩ / আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড-৪) সাধারণতঃ এই মুস্তাহাবগুলোর উপর বর্তমানে আমল করা হয় খুবই কম। সুতরাং এইগুলোকে জিন্দা করা আবশ্যক।

- ঈদুল ফিতরের খুতবায় ছদকায়ে ফিতরের মাসাইল এবং ঈদুল আযহার খুতবায় কুরবানীর আহকাম, জবেহ করার নিয়মপদ্ধতি এবং তাকবীরে তাশরীকের মাসাইল বয়ান করা উচিত। (বেহেশতী গাওহার পৃঃ ৮৬)

- ঈদের খুতবার আগে খতীবের মিম্বরে না বসা সুন্নাত। কিন্তু জুমুআ'র খুতবায় তার বিপরীত। অর্থাৎ বসা সুন্নাত। (আলমগীরি খণ্ড-১ পৃঃ ১২১)

- ঈদের খুতবা নামাযের পর পাঠ করাই সুন্নাত। ঈদের নামাযের আগে খুতবা পাঠ করা মাকরূহ। (বাহরুর রায়েক খণ্ড-২ পৃঃ ১৬২)

জুমুআ'র খুতবা পরোক্ষ ওহী অর্থাৎ ইবাদত

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, খুতবা পরোক্ষ ওহী স্বরূপ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হতো। ফলে জুমুআ'র খুতবা ফরয ইবাদত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বলুনঃ আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তিনি দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া। (সূরা নূর আয়াত ২৪)' উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من احبّنی دقد احبّ الله ومن اطاعنی فقد اطاع الله অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করলো, সে আল্লাহ তাআলাকে মহব্বত করলো। আর যে আমার আনুগত্য হয়ে চললো সে আল্লাহ পাকের অনুগত হয়ে চললো।' এই হাদীস শুনে মুনাফিকরা মন্তব্য করলো যে, অন্যদেরকে তিনি শিরক থেকে নিষেধ করে থাকেন, অথচ এখন দেখছি- আল্লাহর সঙ্গে নিজেকে শরীক করার জন্য লোকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন, তিনি চাচ্ছেন যে, তাকে রব বানিয়ে নেওয়া হোক যেমন নাসারাগণ হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামকে রব বানিয়ে নিয়েছিলো? এরপর আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেছেন। আয়াতের মর্ম হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য আল্লাহ তাআলার আনুগত্য থেকে পৃথক ও ভিন্ন কিছু নয়, সুতরাং এতে কোনরূপ শিরকের সন্দেহ করা যেতে পারে না। যেহেতু হুজুরপাক

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকামই পৌঁছিয়ে থাকেন- যেগুলোর প্রকৃত হুকুমদাতা আল্লাহ তাআলা; কখনোও প্রত্যক্ষ ওহীর (আল-কুরআন) মাধ্যমে, আর কখনো পরোক্ষ ওহীর (সুন্নাহ) মাধ্যমে যেগুলো তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়। তাই রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আনুগত্য। (অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে আল্লাহ'র আনুগত্য করেন, আর উম্মতগণ তাঁকে অনুসরণ করেন। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করার অর্থ কখনো শিরক হতে পারে না।) (সূত্রঃ হুকূকূল মোস্তফা (সাঃ) পৃঃ ২০-২১)

নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য অপরিহার্য হওয়া প্রমাণিত হয়। ইরশাদ হয়েছে- وما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فا نتهوا অর্থাৎ- '... রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক ...।' (হাশ্‌র : ৭)

হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি যখন তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দিই তখন তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো তা পালন করবে এবং যখন তোমাদেরকে কোন কিছু হতে নিষেধ করি তখন তোমরা তা হতে বিরত থাকবে।' (বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ তাফসীর ইবনে কাসীর- সূরা হাশর তাফসীর খণ্ড পৃঃ ৪০২)

একটি উদাহরণ- 'খালিদ ইবন উরফুতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি সায়্যিদিনা হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় আব্দে কায়েস গোত্রের সূস্ নিবাসী এক ব্যক্তিকে হাজির করা হলো। হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, তুমি কি অমুকের বেটা অমুক আব্দি না? সে বললো, হাঁ। তিনি তখন একটি লাঠি দ্বারা তাকে মারলেন। সে বললো, হে আমিরুল মুমিনীন! কি অপরাধ হয়েছে আমার? তিনি বললেন, বসো। লোকটি বসলো। তিনি পড়তে লাগলেন, 'আলিফ-লাম-রা। এইগুলো

হচ্ছে সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি একে নাযিল করেছি কুরআন রূপে আরবী ভাষায়, যেনো তোমরা বুঝতে পারো। আমি যে, এই কুরআন আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি, আর ইহা দ্বারা আমি এক অতি উত্তম ঘটনা আপনার নিকট বর্ণনা করছি, আর আপনি ইহার পূর্বে (এই ঘটনা সম্বন্ধে) একেবারেই অবহিত ছিলেন না।’

হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত আয়াতগুলো তার সম্মুখে তিন বার পড়লেন ও তাকে তিন বার মারলেন। সেই ব্যক্তি বলতে লাগলো, কি অন্যায় হয়েছে আমার? হে আমিরুল মুমিনীন! হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমিই সেই ব্যক্তি যে দানিয়ালের কিতাব নকল করে এনেছো? সে বললো, আপনি আমাকে যা ইচ্ছা আদেশ করুন। আমি তা পালন করবো। তিনি বললেন, যাও! লেখাগুলোয় গরম পানি ঢেলে সাদা পাশম দ্বারা মুছে ফেলো। তুমি তা পাঠ করবে না এবং ভবিষ্যতে কেউ যেনো তা পাঠ করতে না পারে। যদি আমি আবার জানতে পারবো যে, তুমি তা পড়েছো অথবা কাউকে পড়তে দিয়েছো, তবে তোমাকে কঠিন শাস্তি দেবো। অতপর তিনি তাকে বললেন, বসো! সে তাঁর সম্মুখে বসলো। তখন হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, একবার আমি আহলে কিতাবদের নিকট হতে একটি কিতাব নকল করে চামড়ার দ্বারা আবৃত করে নিয়ে এলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমার! তোমার হাতে ওটা কি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইল্‌মের (জ্ঞানের) সাথে আরো ইল্‌ম বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে একটি কিতাব নকল করে এনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হলেন এবং তাঁর গণ্ডদ্বয় (রাগে) লাল হয়ে গেলো। ‘আসসালাতু জামেয়াতুন’ বলে আওয়াজ দেওয়া হলো। আনসারগণ বলতে লাগলেন, তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাগান্বিত হয়েছেন। তোমরা অস্ত্র ধারণ করো, অস্ত্র ধারণ করো। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন, 'হে লোক সকল! আমাকে অতীব সারগর্ভ কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক ও চুড়ান্ত কালাম দান করা হয়েছে, এবং আমার জন্য তা যথেষ্ট সংক্ষেপ করা হয়েছে। আমি তোমাদের জন্য তা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রূপে নিয়ে এসেছি। তোমরা সংশয়গ্রস্ত হবে না এবং সংশয়গ্রস্ত লোকদের ধোঁকায় পড়ো না।' হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আমি রব হিসাবে আল্লাহর প্রতি, দ্বীন হিসাবে ইসলামের প্রতি এবং রাসূল হিসাবে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর হতে নেমে এলেন।" (হায়াতুস্ সাহাবা (রাঃ) পৃষ্ঠা ৫০৪-৫০৪)

অতএব বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলামে নতুন যুক্তি কিংবা বাড়তি কোনো জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। যেহেতু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত শব্দগুলোও ওহীর মধ্যে সামীল। অন্যদিকে সাহাবায়ে কেরামের আমলও সুস্পষ্টভাবে শরীয়তের দলীলের মধ্যে গণ্য। সুতরাং উল্লিখিত ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, খুতবায় আরবী ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। কারণ, ইসলামের কুরআন- হাদীস সারগর্ভ, ব্যাপক অর্থবোধক ও চুড়ান্ত। এটাকে বুঝানোর জন্য, বা এর স্বার্থকতা প্রকাশ করতে হলে ভিন্ন ভাষা অবলম্বনের কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

খারিজী সম্প্রদায়

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজন্ম ছিদ্রান্বেষী মহলের অশুভ তৎপরতার কারণে সমস্ত মুসলিম বিশ্ব আজ ভুল বুঝাবুঝি ও দ্বিধা-বিভক্তিতে ভুগছে। মুসলমানদের মাঝে দ্বিধা-বিভক্তি সৃষ্টিকারী এই মহলটির নাম খাওয়ারিজ বা খারিজী সম্প্রদায়।

খারিজীদের উত্থান ও তৎপরতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হচ্ছে- "হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন দলের ষড়যন্ত্রের কারণ হলো নিম্নরূপ-

এক ব্যক্তির নাম ছিলো আবদুল্লাহ ইবন সাবা। সে ছিলো একজন ইয়াহূদী। সে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং মিসরে বসবাসের জন্যে গমন করলো। কিছু সংখ্যক লোকের কাছে গোপনে এমন কথাবার্তা প্রচার করলো যা সে নিজেই তৈরী করেছিলো। সে এক ব্যক্তিকে বললো, এটা কি প্রমাণিত নয় যে, ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম এ দুনিয়ায় আবার অচিরেই ফিরে আসবেন? লোকটি বললো, হ্যাঁ। আবার সে উক্ত লোকটিকে বললো, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈসা আলাইহিস্ সালাম হতে অধিক মর্যাদাবান। তাহলে তাঁর এ দুনিয়াতে ফিরে আসার ব্যাপারটি তুমি কেনো অস্বীকার করো? তিনি কি ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস্ সালাম হতে অধিক মর্যাদাবান নন?' তারপর সে বললো, 'হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ওসীয়ত করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বশেষ ওসীয়ত প্রদানকারী।' তারপর সে বলে, 'তিনি খিলাফাতের ব্যাপারে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফাতের ব্যাপারে সীমালংঘনকারী। সে তার উপযুক্ত নয়।' (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া বঙ্গানুবাদ খণ্ড-৭ পৃষ্ঠা ৩০২) এইভাবে উদ্ভট জগাখিচুড়ী মার্কা যুক্তি দিয়েই সেই যুগে খারিজীদের উত্থান ঘটেছিলো।

মুসলিম বিশ্বের বিশাল রক্ত-রঞ্জিত ইতিহাস রচনা করে সেই খারিজীরা আজকের বিভিন্ন দল ও মতবাদ-এ রূপলাভ করেছে। সবগুলো দলের জন্মসূত্র এবং কর্মতৎপরতার মূল প্রতিপাদ্য একই। জায়োনিজম বা ইয়াহূদীবাদ। এদের প্রকৃত শ্লোগান এক রকম, অর্থাৎ- মুখে বলে এক কথা, আর কাজ করে আরেকটা। এদের খপ্পরে পড়ে বিশ্বজুড়া সাধারণ মুসলমানরা

যাতে ধ্বংস হয়ে যায়, ইসলাম যাতে বিলীন হয়ে যায়, সেই ষড়যন্ত্রই চলছে। এই জন্যেই পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিশাল অংশে এদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, "হে মুসলমানগণ, তোমরা কি আশা করো যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করতো; অতঃপর বুঝে- শুনে তা পরিবর্তন করে দিতো এবং তারা তা অবগত ছিল।" সূরা বাকারাহ- ৭৫

ইসলামের অনেকগুলো বিষয়ের মতো জুমুআ'র নামাযের খুতবাকেও তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদীস শরীফকে প্রত্যাখ্যান করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারা এটা ভালো করেই জানে যে, পবিত্র কুরআন-হাদীসের ভাষা হচ্ছে আরবী। আর মুসলমানদের ধর্মীয় তথা আর্ন্তজাতিক ভাষাও আরবী। তবে পবিত্র কুরআন শরীফ যেহেতু পরিবর্তন করা যাবে না। তাই তারা হাদীস শরীফ পরিবর্তনের চেষ্টা শুরু করে। প্রথমেই তারা সায়্যিদিনা হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র উপর বিশ্বস্ততা হারানোর জন্যে ওরিয়েন্টালিস্ট নামক মুসলিম নামধারী একটি দলকে দিয়ে সন্দেহ প্রচার শুরু করে। তারা যুক্তি দেখায় যে, হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে বসবাস করেও উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার তুলনায় সায়্যিদিনা হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র হাদীস বর্ণনা সবচে বেশী! তা গ্রহণ করা চিন্তার বিষয়। যখন এরকম বিষয় প্রচার করা হয়, স্বাভাবিকভাবেই উলামায়ে কিরাম বিষয়টির তোয়াক্কা করেন না। কারণ একে তো বিষয়টি মিথ্যা, অন্যদিকে বাজে কথায় কান দিয়ে সময় নষ্ট করা নিরর্থক। অথচ এই মিথ্যাটি দীর্ঘ শতাব্দি বা সহস্রাব্দকাল বহুল প্রচারের ফলে সত্যে রূপান্তরিত হয়ে সমাজে আমুল পরিবর্তনের কারণ হিসেবে দেখা দেয়। এইভাবেই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলো অতীতের খারিজী আধুনিক যুগের ওয়াহাবী, আহলে হাদীস, সালাফী ও মুদুদী ইত্যাদি ফিরকা। এরা একটি অশুভ উদ্দেশ্য

নিয়ে শুরু করেছে জুমুআ'র খুতবায় আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষা ব্যবহারের তৎপরতা। যুক্তি দেওয়া হচ্ছে- 'খুতবা যেহেতু ভাষণ-বক্তৃতা বা ওয়াজ-নসীহত, অতএব যে কোনো ভাষায় দেওয়া যেতে পারে।' ফলে লা-মাযহাবী দলভূক্ত লোকেরা বিষয়টিকে সহজেই গ্রহণ করে নেয়। এদের দেখাদেখি কিছু সংখ্যক সাধারণ মানুষও ধোঁকায় পড়ে যায়। তারা মনে করে, জুমুআ'র শ্রোতাগণ খুতবার ভাষা বুঝতে পারলেই ইসলামের বহুল প্রচার হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপঃ- "ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কোন কোন মসজিদে খুতবায় কিয়দংশ আরবীর পরে স্থানীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়। খুতবা সম্বন্ধে হাদীসগুলি অধ্যয়ন করিলে নিশ্চত ধারণা জন্মে যে, (১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খলীফাগণ সাময়িক সমস্যাদি সম্বন্ধে মৌখিক খুতবা দিতেন। (২) তাঁহাদের কোনও দুইটি খুতবাই এক প্রকার নহে। (৩) মুসলিমগণ তাঁহাদের খুতবা শ্রবণ করিয়া তাহা বুঝিয়াছেন ও তদনুসারে কাজও করিয়াছেন। (৪) তাঁহাদের সময় যেহেতু সকল মুসলিম আরবী বুঝিত তাই আরবীতেই খুতবা দেওয়া হইত। এইজন্য দেশের আধুনিক উলামা সম্প্রদায় মনে করেন যে, খুতবার উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে খুতবার অন্তত উপদেশের অংশটি শ্রোতার বোধগম্য স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ হওয়া সমুচিত এবং বর্তমান গতানুগতিকভাবে যে লিখিত খুতবা পাঠ করা হয় তাহা সুন্নাহসম্মত না হইলেও জাইয। রক্ষণশীল আলিমগণের মতে খুতবায় আরবী ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ।" (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা ৩৭১)

উল্লিখিত উদাহরণ থেকে একটি ইতিহাস পাওয়া গেছে যে, খুতবায় আরবী ছাড়া আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার ভারত উপমহাদেশেই জন্ম লাভ করেছে। একইভাবে- খুতবার উদ্দেশ্য সফল করার যুক্তিতে আধুনিক উলামাদের ধ্যান-ধারণাটিও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সবশেষে লেখা হয়েছে- "রক্ষণশীল আলিমগণের মতে খুতবায় আরবী ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ।" (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা ৩৭১) এতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, খুতবায় আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষা ব্যবহার তৎপরতাটিও মূলত যুক্তির মাধ্যমেই জন্ম নিয়েছে। যে তৎপরতাটির মাধ্যমে খারিজীদের জন্ম হয়েছিলো। আর এই খরিজীরাই জন্ম দিয়েছে এবং এখনোও দিচ্ছে মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন দল, উপদল, মতবাদ ও ফিরকার।

অন্যদিকে এটাও একটা সঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য বিষয় যে, রক্ষণশীল আলিম-উলামাই ইসালেমর প্রকৃত রক্ষণাবেক্ষণকারী। তারাই ইসলামকে রক্ষা করেন। কিন্তু যারা নতুন, আধুনিক, ননপ্র্যাক্টিসিং কিংবা নিজেকে রক্ষণশীল হিসেবে মনে করেন না, প্রকৃত পক্ষে তারাই খারিজী অর্থাৎ ইসলামের ধ্বংস-সাধনকারী।

যুক্তি

যুক্তি শব্দের আভিধানিক অর্থঃ সংযোগ, মিলন, কারণ, হেতু, পরামর্শ, মন্ত্রণা ইত্যাদি। যুক্তি শব্দটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কোনো একটি স্থায়ী বিষয় বা বস্তুর সাথে আরেকটি বিষয় বা বস্তুর সংযোগ বা মিলন ঘটানোকেই যুক্তি বলে। ইসলামের দৃষ্টিতে যুক্তির উদাহরণ নিম্নরূপ-

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে তাঁর দেহের অংশ বিশেষ থেকেই হযরত হাওয়া (আঃ)-কেও সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ বলেন, "তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও উহা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়।" (সূরা ৭, আয়াত ১৮৯) আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলেন, "(স্মরণ করো সে সময়ের কথা), যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।" (সূরা বাকারা, আয়াত ৩০) আরেক স্থানে আল্লাহ তাআলা

বলেন, "তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হইবে না, নগ্নও হইবে না এবং সেখানে পিপাসার্তও হইবে না, রৌদ্রক্লিষ্টও হইবে না।" (সূরা ২০, আয়াত ১১৮-১১৯)

উপরোক্ত তিনটি আয়াতের অপব্যাখ্যা করেই সম্ভবত স্বর্গের দেশ 'জান্নাতুল মাওয়া'য় সর্বপ্রথম প্রতারণামূলক একটি যুক্তির সৃষ্টি করেছিলো অভিশপ্ত শয়তান। যুক্তিনির্ভর এবং অপব্যাখ্যার মাধ্যমেই মানুষ আজ 'পরীক্ষা কেন্দ্র' নামক পৃথিবীর বাসিন্দা। আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে অহংকারী শয়তান যখন হযরত আদম (আঃ)-কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানালো, তখন তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত শয়তান, জান্নাতের দরোজার বাইরে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মধুর ও সঙ্গিতের সুরেলা কণ্ঠে হযরত আদম (আঃ)-কে ডাকতে থাকে। শয়তানের সে আহ্বানকে পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, "অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রণা দিলো। সে বলিল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলিয়া দিবো জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?" (সূরা ২০, আয়াত ১২০)

হযরত আদম (আঃ) জবাবে বলেন, 'তুমি কোন বৃক্ষের কথা বলছো হে? জবাবে শয়তান তাঁকে সেই বৃক্ষের কথাটি বললো, যে বৃক্ষের কাছে যেতে আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে নিষেধ করেছিলেন। হযরত আদম (আঃ) বললেন, এটা তো নশ্বর ও পতনের বৃক্ষ। অবিনশ্বর ও অমরত্বের বৃক্ষ তো এটা নহে। এই বৃক্ষ তো অপমাণিত ও লজ্জিত হবার বৃক্ষ। আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও তাঁর দরবারে সম্মান বৃদ্ধির পরিবর্তে দূরত্ব বৃদ্ধি ও অপদস্থ হবার কারণ। সে কারণেই আল্লাহ্ তাআলা এই বৃক্ষের ধারে-কাছে যেতে নিষেধ করেছেন।'

হযরত আদম (আঃ)-এঁর কাছে সুযোগ না পেয়ে শয়তান তখন হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সুরে সুরে বললো, আমি কি আপনাকে এমন একটি সুসংবাদ দেবো, যে সুসংবাদে আপনারা লাভবান হবেন? শয়তানের এই কোমল ও মধুর কণ্ঠের গীতিময় কথাগুলো পবিত্র কুরআনে হুবহু লিপিবদ্ধ

করা হয়েছে, "পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এইজন্যেই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। সে তাহাদের উভয়ের নিকট শপথ করিয়া বলিল, আমি তো তোমাদের হিতাকাংখীদের একজন। এইভাবে সে তাহাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করিল।" (সূরা ৭, আয়াত ২০-২২)

হযরত হাওয়া (আঃ) বললেন, ফেরেশতা হয়ে না যাই, এ কথার অর্থ কি? শয়তান বললো, তোমাদের প্রভু তোমাদের ক্ষতি হবে ভেবে এই বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেন নাই, বরং তোমরা যাতে চির অমর অথবা ফেরেশতায় পরিণত না হও সে জন্যেই তিনি তোমাদের নিষেধ করেছেন। যেহেতু ফেরেশতাদের না আছে পানাহারের দুশ্চিন্তা, আর না আছে স্ত্রী-পুত্রের ভাবনা। তোমাদেরকে তো বলেই দিয়েছেন যে, "তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হইবে না, নগ্নও হইবে না এবং সেখানে পিপাসার্তও হইবে না, রৌদ্রক্লিষ্টও হইবে না।" (সূরা-২০ আয়াত-১১৮-১১৯) অতএব তোমরাও যদি ফেরেশতাদের মতো হয়ে যাও, তাহলে খিলাফতের গুরুদায়িত্ব কী করে পালিত হবে? তোমার কি মনে নেই যে তোমার প্রতিপালক বলেছেন, "(স্মরণ করো সে সময়ের কথা), যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।" (সূরা বাকারা আয়াত-৩০) সুতরাং পৃথিবীর খিলাফতের দায়িত্ব তো স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, পানাহার ও আয়-উপার্জনের ব্যস্ততার মাধ্যমেই পালন করতে হবে। আর এটা বলাই বাহুল্য যে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী কখন হবে? তোমাদের দ্বারা খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করানোই যেহেতু তাঁর উদ্দেশ্য, তাই নিজের নিকট থেকে তোমাদেরকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আসলে তোমরা তাঁর কথা বুঝতে প্যাঁচ লাগিয়েছো। কারণ- এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণে যেহেতু আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ ঘটে, তাই তোমাদেরকে এটা থেকে বিরত রাখা হচ্ছে। অন্যদিকে, বেহেশতে মৃত্যু নাই। তোমাদেরকে কেবল খিলাফতের রীতি-

নীতি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে কিছু দিন বেহেশতে বসবাসের আদেশ দেয়া হয়েছে। তারপর তিনি তাঁর নৈকট্য হতে দূরে পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। সেখানে গিয়ে তোমাদের ও তোমাদের সন্তান-সন্ততির নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাত লাভের পর আল্লাহ্ তাআলার এই নৈকট্য আর তোমাদের ভাগ্যে জুটবে না।' শয়তানের যুক্তিপূর্ণ ভাষণ আর পবিত্র কুরআনের পরম সত্যের উদাহরণ শুনে হযরত হাওয়া (আঃ)-এঁর মন গলে গেলো। পরবর্তীতে যা হবার তা-ই হলো। (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা ৭ তাফসীর পৃঃ ২০-২২)

পবিত্র এবং পরম সত্য কয়েকটি বাক্যকে উপমার মাধ্যমে উল্লিখিত একটি মিথ্যা যুক্তি খাড়া করেছিলো মানুষের চিরশত্রু ইবলিস। দার্শনিকদের ভাষায় এটাকে বলা হয় 'যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ।' এই শাস্ত্র বা গবেষণার প্রধান কাজ হচ্ছে দু'টো। এক- অধিবিদ্যা বা সৃষ্টিতত্ত্বের দিকে মানুষের ঘৃণার জন্মদান। দুই- বিজ্ঞান ও গণিতের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা। অর্থাৎ যৌক্তিক প্রত্যক্ষ বাদীদের ভাষায়- যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তত্ত্ববিদ্যার অসারতা প্রতিপন্ন করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারকরণের উদ্দেশ্যে কতকগুলো সুষ্ঠু পন্থা আবিষ্কার করার নামই যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ বা যুক্তিবিদ্যা। সহজ ভাষায় এটাই বলা যায় যে, যুক্তিবিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে- তত্ত্ববিদ্যা বা সৃষ্টিতত্ত্বকে অস্বীকার করার জ্ঞান লাভ। যেমন- "এ মতবাদ অনুসারে তত্ত্ববিদ্যার ভাষার কোন জ্ঞানজ (cognitive meaning) নেই এবং এ হলো অর্থহীন কথার তুবড়ী (a bundle of nonsense) মাত্র। তত্ত্ববিদ্যার বাক্য সত্য নয়, মিথ্যাও নয়, বরং অর্থহীন। উল্লেখ্য যে যৌক্তিক প্রত্যকক্ষবাদ 'অর্থহীন' বলতে জ্ঞানজ অর্থ নেই বুঝায়।" (তথ্যসূত্র- দর্শনের কথা পৃষ্ঠা ২১৫)

অতএব যুক্তির নিরিখে যারা ইসলামকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অস্তিত্ব এবং তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বকে অস্বীকার করে অভিনব বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। তাদের

সম্পর্কে ইতিহাসে বর্ণিত রয়েছে যে, সায়্যিদিনা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তোমাদের কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করি, তখন জানিও যে, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম) নামে কোন মিথ্যা কথা বলার চেয়ে আকাশ থেকে পতিত হওয়াও আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আর আমি ও তোমরা যখন পরস্পর কথা বলি মনে রেখো- যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করা বৈধ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি। তিনি বলেছেন, শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্য থেকে একদল লোক বের হবে। তাদের বয়স কম হবে এবং জ্ঞানের দিকে তারা হবে মূর্খ। তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের ন্যায় উত্তম কথা বলবে। তারা কুরআন পাঠ করবে। কিন্তু তোমাদের কিরাআত তাদের কিরাআতের তুলনায় তুচ্ছ মনে হবে। তোমাদের সালাত (নামায) তাদের সালাতের তুলনায় কিছুই নয়। তোমাদের সওম তাদের সাওমের তুলনায় কিছুই মনে হবে না। তারা কুরআন পাঠ করবে এই ভেবে যে, কুরআন তাদের কল্যাণ দান করবে কিন্তু আসলে তা তাদের অকল্যাণ ডেকে আনবে। তাদের সালাত তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর তার শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।" সায়্যিদিনা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, "দ্বীন যদি মানবীয় মতামত নির্ভর হতো তাহলে মোজার (চামড়ার মোজা) উপরের চেয়ে তলায় মাস্হে করাই উত্তম হতো। কিন্তু আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি মোজার উপরেই মাস্হে করতে দেখেছি। (আল-হিদায়া পৃষ্ঠা ৩৮)

সকল মাযহাবের এটা গৃহীত সিদ্ধান্ত যে, ওযুর ফরয চারটি। ১) সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধোয়া। ২) কনুইসহ একবার উভয় হাত ধোয়া। ৩) মাথার চার ভাগের এক ভাগ একবার মাসেহ করা। ৪) টাখ্নুসহ উভয় পা একবার ধোয়া।

অন্যদিকে, ওযু নষ্ট হওয়ার কারণের একটি প্রধান কারণ এমন আছে যে,

যদি মলদ্বার দিয়ে বায়ু বের হয়, তাহলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। এই সিদ্ধান্তটিও সকল মাযহাবেই এক এবং অভিন্ন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে- বায়ু বের হওয়ার কারণে যে স্থানটি দুর্গন্ধময় (?)[১] বা অপবিত্র (?)[২] হলো, সে স্থানটি ধৌত না করে শরীরের অন্যান্য স্থান ধুয়ে পরিষ্কার করলেই পবিত্রতা অর্জিত হয়। এখানে যুক্তি নির্ভর বিধানের কোনো স্থান নেই।

সুতরাং রক্ষণশীল উলামায়ে কিরাম এইসব বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন ঠিকই, কিন্তু যুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ কিংবা বর্জন করেন না। যেহেতু আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ থেকে জানা গেছে যে, জান্নাত ও জাহান্নামের স্বরূপ বর্ণনা দেয়া যাবে, কিন্তু উদাহরণ দেয়া যাবে না। কারণ- এরকম কিছুই পৃথিবীতে বিদ্যমান নেই, যার সাথে তুলনা করা যাবে। অতএব- 'যা দেখবো তা মানবো' এই নীতিকে ইসলামে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামের নীতি হচ্ছে- কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক। অর্থাৎ ব্যক্তি ও কর্ম সবই থাকতে হবে কুরআন-হাদীসের ভেতরে সীমাবদ্ধ। এই কারণেই ইসলামে যুক্তিবাদীদের কোনো স্থান নেই। যুক্তির মাধ্যমে কোনো ফিক্‌হী সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয় না। অবশ্য লা-মাযহাব একদল আধুনিক হিংসুটে সমালোচক আবিষ্কার করেছেন যে, হানাফী মাযহাবে ১২৫টি মাসাআলা রয়েছে সহীহ হাদীসের বিপরীতে, অর্থাৎ যুক্তিনির্ভর। অথচ পরবর্তীতে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি মাসআলাও সহীহ হাদীসের বিপরীত কিংবা যুক্তিনির্ভর নয়। বরং ঐ হাদীসগুলো সমালোচকদের চোখে পড়েনি বিধায় এমনটি ঘটেছে।

জুমুআ'র খুতবা প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অভিমত হচ্ছে- 'আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া মাকরূহ।' কারণ, 'হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কাজ করার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তা পরিত্যাগ করতেন এই ভয়ে যে, লোকজন

তার দেখাদেখি তা নিয়মিত করতে থাকবে, ফলে এটা তাদের ওপর ফরয করে দেয়া হবে।" (বুখারী আস্‌সাহীহ, মুসলিম আস্‌সাহীহ্)

অনুরূপভাবে, জুমুআ'র নামায এমনিতেই ফরয। উপরন্তু খুতবাও যদি ফরয হয়ে যায়, তাহলে ব্যাপারটা কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে। যা অন্যান্য মাযহাবের গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অভিমত হচ্ছে- অপ্রত্যাশিত কারণে কেউ যদি জুমুআ'র খুতবা আঞ্চলিক ভাষায় দিয়েও দেয়, তাহলে তাদের নামায বিনষ্ট হবে না। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার নামায ও খুতবা আদায় করতে হবে না, সেদিকে খেয়াল করেই খুতবায় অন্য ভাষা ব্যবহারকে মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। তবে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, হানাফী মাযহাবে ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে জুমুআ'র খুতবায় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার মাকরূহ' সাব্যস্ত হওয়ার অর্থ কিন্তু জায়েয নয়! বরং নিষিদ্ধ হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। এ বিষয়ে যুক্তির কোনো স্থান নেই।

অন্যদিকে, যুক্তির মাধ্যমে সুন্নাতের পরিপন্থী কাজকেই বিদআত বলে। সুতরাং কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত কোনো মাসআলাকে যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করে নতুন মাসআলা আবিষ্কার করাও বিদআত এবং এরকম আবিষ্কৃত মাসআলা অনুসরণ করা হারাম।

অতএব দ্বীনের হিদায়াত প্রাপ্তির সাথে বুঝ (তাফহীম) কিংবা যুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। হিদায়াত একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সিদ্ধান্তেই হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনেই একথার প্রমাণ রয়েছে। কেবল খুতবার ভাষা বুঝলেই যে, মানুষ হিদায়াত প্রাপ্ত হয়ে যাবে, এমন কথাও শুদ্ধ নয়।

বৃটেনে লা-মাযহাবী তৎপরতায় পরিচালিত এমন কিছু মসজিদ আছে, যেখানে ইদানিং জুমুআর খুতবায় বহুভাষা ব্যবহার করা হয়। অথচ বহুভাষা বলতে তারা শুধুমাত্র আরবী ও ইংরেজীর ব্যবহার করেন। অর্থাৎ তারা একথা বুঝাতে চান যে, আরবী হচ্ছে মুসলমানদের ভাষা এবং ইংরেজী হচ্ছে

আর্ন্তজাতিক ভাষা। অথচ এই বিষয়টি তাদের মাথায় ঢুকে না যে, বৃটেনের অধিকাংশ মসজিদে অন্ততঃ পাঁচ-সাতটা ভাষার লোক উপস্থিত থাকে। বাঙালী অধ্যুষিত মসজিদে অন্ততঃ চৌদ্দ আনা মুসল্লী থাকেন বাঙালী। এদের অধিকাংশই ইংরেজী বুঝে না। কিন্তু খতীব সাহেব খুতবা পাঠ করেন ইংরেজীতে। আর এদের মধ্যে যারা ইংরেজী বুঝে তাদের অধিকাংশই 'জুম্মাবারের মুসল্লী'। এরা শুধুমাত্র ঈমানের দাবি আদায়ের জন্যে সারা সপ্তাহের কেবল জুমুআ বারেই মসজিদে আসে। তা ছাড়া জুমুআর খুতবায় খতীব সাহেবের দু'চারটা ভিন্নভাষী খুতবার শব্দে কিন্তু কুরআন কর্তৃক নির্দেশিত 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কর্মের নিষেধ'-এর প্রকৃত দাবি আদায় হয় না। কারণ- এই সকল লা-মাযহাবী খতীবগণ ভালো করেই জানেন যে, পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী জনগণকে 'সৎ কাজের আদেশ' দিতে গেলে প্রথমে তাকেই কারাগারে যেতে হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের বর্তমান সরকার তাকে সন্ত্রাসী তৎপরতার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করবে। বৃটেনের ইতিহাসে এরকম ঘটনার অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। তা ছাড়া জুমুআ'র খুতবায় ভিন্ন ভাষা ব্যবহারের ফাতাওয়ায় একটি সিদ্ধান্ত এরকমও আছে যে, কেউ যদি মোটেই আরবী ভাষা জানে না, কিংবা আরবী পড়তে পারে না, তার জন্যে অন্তত জুমুআ'র নামায আদায়ের স্বার্থে ভিন্ন ভাষায় খুতবা দেওয়া জায়েয[১]। কিন্তু এই বিশেষ সুযোগটাকে সামনে নিয়ে যারা যুক্তির নিরিখে ফাতাওয়া আবিষ্কার করেছেন, তারা কিন্তু বোকা কিংবা অশিক্ষিত নন। বরং বহু ভাষায় কথা বলা ও বক্তব্য দেয়ার মতো অভিজ্ঞতা রাখেন।

অন্যদিকে, আরবীকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো ভাষায় যদি ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত হতো, তাহলে পবিত্র কুরআন-হাদীসের ভাষা হতো ডজন ডজন। উচ্চারণের বিভিন্নতার কারণে অর্থ বিকৃতি ঘটতো মারাত্মকভাবে। তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিলের মতো পবিত্র কুরআন শরীফও তার মূলনীতি হারিয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে যেতো। সুতরাং যে বা যারাই জুমুআ'র খুতবায় ভিন্ন ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতি, তারা নিঃসন্দেহে হাদীস

প্রত্যাখ্যানকারী দলের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি তারা ইসলামের শত্রুদের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

খুতবা সম্পর্কে মডারেটপন্থীদের দাবি-এক

দাবি- ১ ঃ খতীব দু'টি খুতবা দেবেন। প্রথম খুতবায় শ্রোতাদেরকে দ্বীনের নির্দেশ এবং তার উপর আমল করা শিখাবেন এবং দ্বিতীয় খুতবায় কুরআনের কিছু আয়াত পড়বেন, নবীর উপর দুরুদ পড়বেন এবং আসহাবে রাসূল (সঃ) এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্যে দোয়া করবেন। (আসান ফেকাহ পৃষ্ঠা ২৯৮)

উল্লিখিত দাবীর প্রেক্ষিতে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যাঃ- '*খুতবার এ বুনিয়াদী উদ্দেশ্য তখনই পূরণ হতে পারে যখন খতীব শ্রোতাদেরকে তাদের নিজস্ব ভাষায় সম্বোধন করবেন যাতে করে শ্রোতাগণ বুঝতে পারেন। কিন্তু আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় খুতবা দেয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। আসল কথা এই যে, প্রথম খুতবা প্রকৃতপক্ষে ওয়াজ-উপদেশ, দ্বীনের মর্মকথা মানুষকে বুঝানো প্রভৃতি বিষয়ে দেয়া হয়। এবং আরবী ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায়ও দেয়া যায়। অবশ্য দ্বিতীয় খুতবা আরবীতেই হওয়া উচিত। আর যেখানে মুসলমানদের কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় সেখানে দুটি খুতবাই আরবীতে হওয়া উচিত। শ্রদ্ধেয় মওদুদী (র) এ বিষয়ে তার মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, এই হওয়া উচিত যে, খুতবার এ অংশ (দ্বিতীয় অংশ) অবশ্যই আরবী ভাষায় হবে। এ অংশ আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা, আল্লাহর রসূল (সঃ) তাঁর আসহাব, আল-আওলাদ প্রভৃতির উপর সালাত ও সালাম এবং কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতের জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে। তারপর দ্বিতীয় অংশে (প্রথম খুতবা) ওয়াজ নসীহত এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামী শিক্ষা এসব কথা এমন ভাষায় হওয়া উচিত*

যা সকল শ্রোতা অথবা তাদের অধিকাংশ বুঝতে পারেন। এ উদ্দেশ্যে বেশির ভাগ এমন ভাষা ব্যবহার করা উচিত যা মুসলমানদের নিকটে আন্তর্জাতিক বা আন্ত প্রাদেশিক মর্যাদা রাখে। যেমন ভারতে (বৃটিশ ভারতে) প্রাদেশিক ভাষা অথবা স্থানীয় কথ্যভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষায় খুতবা হওয়া উচিত। কারণ উর্দু প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের লোক বুঝতে পারে, অবশ্যি দূর দূরান্তের স্থানগুলোতে যেখানে লোক উর্দু বুঝতে পারে না স্থানীয় ভাষায় খুতবা দেয়া যেতে পারে। কিন্তু যেখানে মুসলমানদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন হবে সেখানে আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় খুতবা দেওয়া উচিত নয়। (তাফহীমাত ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৪২)

মাওলানা মওদুদী সাহেব আরো বলেন, *'আসলে খুতবার ব্যবস্থা এ জন্যে করা হয়নি যে, লোক সপ্তাহে একদিন গতানুগতিকভাবে এমন এক জিনিস শুনবে যেমন খৃষ্টান গির্জাগুলোতে Sermon বা সদুপদেশ শুনানো হয়ে থাকে। বরঞ্চ এ খুতবাকে মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনের একটা সক্রিয় অংশ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, সপ্তাহে একবার অনিবার্যভাবে সকল মুসলমানকে একত্র করে আল্লাহর নির্দেশাবলী শুনিয়ে দিতে হবে, দ্বীনের শিক্ষা তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দিতে হবে। ব্যক্তি বা জামায়াতের মধ্যে কিছু অনাচার দেখা দিলে তা সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে, সমাজ কল্যাণমূলক কাজে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। উপরন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান সরাসরি সরকারের পলিসি জনসাধারণের সামনে পেশ করবেন এবং প্রত্যেকের প্রশ্ন করার অথবা নিজের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হবে।* (তাফহীমাত ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৩৫)

মাওলানা মুওদুদী সাহেব এ সম্পর্কে আরো লিখেছেন, *'যে সকল দেশে কাফের শাসক হবে সেখানে মুসলমানদের নিজেদের পক্ষ থেকে জুমা এবং দু'ঈদের নামাযের ব্যবস্থা করা দুরস্ত হবে। সেখানে মুসলমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যাকে কাযী বানানো হবে তিনি কাযী হবেন এবং তার জন্যে*

ওয়াজেব হবে মুসলিম শাসকের দাবি করা এবং তার জন্যে সংগ্রাম করা। মাওলানা আবদুল হাই ফিরিংগী মহল্লী তো এতোখানি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, যেসব দেশে অমুসলমান শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সেখানকার মুসলমানদের উপরেও জুমা ওয়াজেব। মোগল শাসনের পর যখন ভারতে ইংরেজ শাসন কায়েম হয়, তখন এ প্রশ্ন ওঠে যে এখানে জুমা জায়েজ কিনা। কিছু স্থবীর ধরনের লোক মনে করলেন যে, যেহেতু জুমার জন্যে মুসলিম শাসন হওয়া শর্ত সে জন্যে ভারতে জুমার নামায না পড়াই উচিত। কিন্তু মাওলানা আবদুল হাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, মুসলিম শাসক না থাকলেও মুসলমানদের উপর জুমা ফরয।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতে যেখানে খৃস্টানদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে এবং তারা কাফের শাসক নিযুক্ত করেছে, জুমা ওয়াজেব এবং মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে তা আদায় করা দুরস্ত হবে, যে কেউ জুমা রহিত হওয়ার ফতোয়া দেবে সে নিজেও গোমরাহ্ এবং অপরকেও গোমরাহ করবে- (তাফহীমাত ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৪১০/ আসান ফেকাহ পৃষ্ঠা ২৯৩-২৯৪)

খুতবা সম্পর্কে মডারেটপন্থী শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্য ও মন্তব্য থেকে যে ক'টি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে-

১. **আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তে ভুল আবিষ্কার করে নিজস্ব যুক্তি ও মন্তব্য ঢুকিয়েছেন।**

২. **মুসলমানদের আন্তর্জাতিক পবিত্র (আরবী) ভাষাকে দলীয় স্বার্থে মূল্যায়ন করা হয়েছে।**

৩. **ইংরেজ শাসনের দালালী করতে গিয়ে পূর্বসূরী উলামায়ে কিরামকে কটাক্ষ বা গালি দিয়েছেন।**

৪. **জুমুআর নামায ও খুতবার মতো ফরয একটি ইবাদতকে নিয়ে**

রাজনীতি করেছেন।

৫. **আল্লাহর নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ এবং হাদীস প্রত্যাখ্যানের অপকৌশল।**

খুতবা সম্পর্কে মডারেটপন্থীদের দাবি-দুই

দাবি-২ "ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কোন কোন মসজিদে খুতবায় কিয়দংশ আরবীর পরে স্থানীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়। খুতবা সম্বন্ধে হাদীসগুলি অধ্যয়ন করিলে নিশ্চত ধারণা জন্মে যে, (১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খলীফাগণ সাময়িক সমস্যাদি সম্বন্ধে মৌখিক খুতবা দিতেন। (২) তাঁহাদের কোনও দুইটি খুতবাই এক প্রকার নহে। (৩) মুসলিমগণ তাঁহাদের খুতবা শ্রবণ করিয়া তাহা বুঝিয়াছেন ও তদনুসারে কাজও করিয়াছেন। (৪) তাঁহাদের সময় যেহেতু সকল মুসলিম আরবী বুঝিত তাই আরবীতেই খুতবা দেওয়া হইত। এইজন্য দেশের আধুনিক উলামা সম্প্রদায় মনে করেন যে, খুতবার উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে খুতবার অন্তত উপদেশের অংশটি শ্রোতার বোধগম্য স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ হওয়া সমুচিত এবং বর্তমান গতানুগতিকভাবে যে লিখিত খুতবা পাঠ করা হয় তাহা সুন্নাহসম্মত না হইলেও জাইয। রক্ষণশীল আলিমগণের মতে খুতবায় আরবী ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ।" (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা ৩৭১)

উল্লিখিত মডারেটপন্থীদের দাবি এক-এর জবাব

১. এটা প্রমাণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে তাবিঈগণের যুগ পর্যন্ত ইতিহাস বিচরণ করলে, জুমুআ'র খুতবায় আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহারের অস্তিত্ব খুঁজে

পাওয়া যায় না। যদিও মুসলিম রাষ্ট্র শাসন তখন এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো। কিন্তু কোথাও জুমুআ'র খুতবা আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় পঠিত হয়নি।

জুমুআ'র খুতবা সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত যিকির অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ। অথচ শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেব জুমুআ'র খুতবাকে খৃস্টানদের গতানুগতিক সদুপদেশের সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি খুতবাকে আধুনিকায়নের রূপ দিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের ভাষাকে অবমূল্যায়ন করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি পবিত্র কুরআনের ভাষাকেই কটাক্ষ করেছেন। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন, 'খুতবার এ বুনিয়াদী উদ্দেশ্য তখনই পূরণ হতে পারে যখন খতীব শ্রোতাদেরকে তাদের নিজস্ব ভাষায় সম্বোধন করবেন যাতে করে শ্রোতাগণ বুঝতে পারেন।' অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে।" সূরা বাক্বারাহ, আয়াত ১৪৬

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয়, ওহী নাযিলের স্বরূপ, ওহীর প্রকার এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত জীবনকর্মই যে ওহীর মধ্যে সামিল তা হয়তো উক্ত লা-মাযহাবীদের নতুন করে বুঝাতে হবে না। এমনকি শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেবের অন্যান্য লেখায় এবং খুতবার ভাষা সংক্রান্ত এই রাজনৈতিক যুক্তিকে তিনি নিজেই প্রত্যাখ্যান করেছেন।

২. শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেব পাঠকদের চোখে ধাঁধাঁ লাগানোর জন্যে তিনি তার লেখায়, প্রথমে দ্বিতীয় খুতবার ফতোয়া দিয়েছেন। যাতে সাধারণ পাঠকগণ মওদুদী সাহেবের প্রতি দরদী হয় এবং একথা বলে যে,

মওদুদী সাহেব অত্যন্ত পরহেজগার ব্যক্তি! তিনি আরবী ভাষার মূল্যায়নকে প্রথমেই আলোচনা করেছেন। অথচ এই পদ্ধতি হচ্ছে সাধারণ মানুষের ব্রেনওয়াশ বা মগজ ধোলাই করার রাজনীতি। এ ছাড়াও তিনি জুমুআ'র প্রথম খুতবার ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে আরবী ভাষার আন্তর্জাতিক মানকে ক্ষুন্ন করেছেন। এমনকি তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতৃভাষার সমালোচনা করেছেন। যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম কখনো আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় খুতবা দেন নাই। যদিও অনেক সাহাবী ভিন্ন ভাষা জানতেন এবং ইসলামের দাওয়াতী কাজে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। কারণ তারা এটা ভালো করেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আবিষ্কৃত জুমুআ'র খুতবাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহীর মধ্যে সামিল এবং এটা একটা ইবাদত।

৩. শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেব অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলিল ভাবে ভারতের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামের এমন সমালোচনা করলেন, যা অত্যন্ত আপত্তিকর। একটি মাত্র বাক্য দিয়ে ইতিহাসের একটি বিরাট অধ্যায়কে অবমূল্যায়ন করেছেন। যে ইতিহাসের ভেতর লুকিয়ে রয়েছে লাখ লাখ মুসলমানের ঈমান-আমল, জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু। ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের শিক্ষিত মাত্রেই এটা জানেন যে, বৃটিশ ভারতের উলামায়ে কিরাম সেদিন দারুল হরব ফাতাওয়া দিয়ে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের যে ডাক দিয়েছিলেন, সে আন্দোলনের কারণেই দেশ স্বাধীন হয়েছে। তা-না হলে সমগ্র ভারত অন্তত হাজার বছরেও স্বাধীনতা পাবার কথা ছিলো না। অন্যদিকে ইসলামের দৃষ্টিতে এবং সকল মাসআলা-মাসায়েলের বিচারে ভারতবর্ষে সেদিন জুমুআ না পড়ার সিদ্ধান্ত (দারুল হরব) সঠিক ছিলো। একই সাথে রাজনীতির দিক থেকে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যেও এই ফাতোয়াটা ছিলো অত্যন্ত সময়োপযোগী।

অথচ ইতিহাসের শত বছর পর শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেব সেই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে নিজেকে নিজেই বৃটিশের স্বীকৃত দালাল হিসেবেই প্রমাণ করলেন।

৪. শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেব লিখেছেন, 'আর যেখানে মুসলমানদের কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় সেখানে দুটি খুতবাই আরবীতে হওয়া উচিত।' অর্থাৎ মুসলমানদের উপর জুমুআ'র নামায ও খুতবা হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ অর্থাৎ ইবাদত। অথচ শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেবের যুক্তির অর্থ হলো- মুসলিমরা যখন নিজের ঘরে থাকবে, তখন যা-খুশি ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে আপত্তি নেই। কিন্তু বাইরে কিংবা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বসলে অবশ্যই ভালো মুসলিম সাজতে হবে। অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারাদের মতো আল্লাহর সাথে প্রকাশ্য অবাধ্যতা?

কিন্তু যে সকল গতানুগতিক সম্মেলনে শরীয়তের নির্দেশের কোনো সম্পর্ক নেই, সেখানে খুতবা দেওয়া হবে আরবীতে! সাধারণ মুসলমানগণ বুঝে উঠতে পারছেনা যে, মওদুদী সাহেবের যক্তিপূর্ণ এই খুতবাগুলো ইসলামের জন্যে? না কোনো রাজনৈতিক দলের জন্যে? তাঁর ব্যাখ্যা করা খুতবা মুসলিমদের আল্লাহ'র জন্যে, নাকি অন্য কাউকে খুশি করার জন্যে? অথচ সবাই একথা জানে যে, মুসলমান হতে হলে প্রথমে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং কার্যে প্রমাণ করার নামই ইসলামী জীবন-যাপন, বা প্রকৃত মুসলমান হওয়া। বাইরে এক রকম এবং ভিতরে আরেক রকম ইবাদত করার নাম মুসলমান নয়।

৫. শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেব সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, "....ব্যক্তি বা জামায়াতের মধ্যে কিছু অনাচার দেখা দিলে তা সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে, সমাজ কল্যাণমূলক কাজে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। উপরন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান সরাসরি সরকারের পলিসি

জনসাধারণের সামনে পেশ করবেন এবং প্রত্যেকের প্রশ্ন করার অথবা নিজের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হবে।" অথচ শ্রদ্ধেয় মওদুদী নির্দেশিত ও পরিবেশিত 'আসান ফেকাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'খুতবার সময় চুপচাপ বসে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনা ওয়াজেব-শ্রোতা খতীবের নিকটে থাক অথবা দূরে।' এখন প্রশ্ন জাগে যে, ভিন্ন ভাষায় খুতবাদানের পক্ষে তিনি জোরালো বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছেন, 'খুতবায় জনগণকে প্রশ্ন করার কিংবা বক্তব্য দেবার সুযোগ দিতে হবে।' অন্যদিকে খুতবার আহকাম ও আদব সম্পর্কে তিনি নিজেই ফতোয়া দিচ্ছেন, 'খুতবা চলাকালে চুপচাপ থাকা ওয়াজিব।' (তথ্যসূত্রঃ আসান ফেকাহ পৃষ্ঠা ৩০০) অর্থাৎ খুতবার মধ্যখানে কেউ কথা বললে ওয়াজিব প্রত্যাখ্যান করলো। আর মওদুদী সাহেব বলছেন, 'জনগণকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে', তাহলে তিনি কি আল্লাহ'র নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করছেন?

দাবি- দুই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জুমুআ'র নামায কেবল শাসক কর্তৃক অনুষ্ঠিত এবং পরিচালিত হয়ে থাকে। এটাই জুমুআ'র নামায ও খুতবা সম্পর্কে আল-কুরআনের নির্দেশ। সুতরাং বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীর কোথাও যেহেতু ইসলামী শাসন ও শাসক নেই! সেখানে জুমুআ'র অনুষ্ঠানকে কেবল ইবাদতের দৃষ্টিতে পরিচালনা করাই যুক্তিযুক্ত। অন্যদিকে- জুমুআ'র খুতবায় আরবী ভিন্ন আঞ্চলিক, প্রাদেশিক কিংবা আন্ত-প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারের দাবীকে রক্ষণশীল উলামা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তারা মনে করেন- **একঃ** খুতবায় ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করলে পবিত্র কুরআনের ভাষাকে অবমূল্যায়ন করা হয়। **দুইঃ** বিশাল মানব সমাজে আরবী ভাষাকে গুরুত্বহীন করা হয়। **তিনঃ** পক্ষান্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত

কার্যকলাপকে মর্যাদাহীন করা হয়। **চারঃ** রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যে সন্দেহ ঢুকানো হয়।

যেহেতু পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকরী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবর্তীণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার অতঃপর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশতঃ তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে হিদায়াত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন।" (সূরা বাক্বারাহ, আয়াত ২১৩)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমরা দুনিয়ায় আগমন হিসেবে সর্বশেষ বটে, কিন্তু কিয়ামতের দিন বেহেশতে প্রবেশ লাভ হিসেবে আমরা সর্ব প্রথম হবো। আহলে কিতাবকে আল্লাহর কালাম আমাদের পূর্বে দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে দেয়া হয়েছে পরে। কিন্তু তারা মতভেদ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। জুমুআ' সম্বন্ধেও এদের মধ্যে মতবিরোধ রয়ে যায়। কিন্তু আমাদের এই সৌভাগ্য লাভ হয় যে, এই দিক দিয়েও সমস্ত আহলে কিতাব আমাদের পিছনে পড়ে যায়। শুক্রবার আমাদের, শনিবার ইয়াহূদীদের এবং রবিবার খ্রীষ্টানদের।'

হযরত যায়েদ বিন আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জুমুআ ছাড়াও কিবলার ব্যাপারেও এটা ঘটেছে। খ্রীষ্টানেরা পূর্ব দিককে বানিয়েছে, ইয়াহূদীরা কিবলা করেছে বায়তুল মুকাদ্দাসকে, কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীগণ কা'বাকে তাদের কিবলা রূপে নির্ধারিত

করেছেন। অনুরূপভাবে নামাযেও মুসলমানেরা অগ্রে রয়েছে। আহলে কিতাবের কারও নামাযে রুকু আছে কিন্তু সিজদা নেই, আবার কারও সিজদা আছে কিন্তু রুকু নেই। আবার কেউ কেউ নামাযে কথা-বার্তা বলে থাকে, আবার কেউ কেউ নামাযে চলাফেরা করে থাকে। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের নামায নীরবতা ও স্থিরতার সাথে পালিত হয়। এরা নামাযের মধ্যে না কথা বলে, না চলাফেরা করে। এরকমই রোযার ব্যাপারেও তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু এতেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাত সুপথ প্রদর্শিত হয়েছে। পূর্বে উম্মতবর্গের কেউ কেউ তো দিনের কিছু অংশ রোযা রাখতো। কিন্তু আমাদের রোযা সবদিক থেকেই পূর্ণতা প্রাপ্ত এবং এর মধ্যে আমাদেরকে সত্য পথ সম্মন্ধে বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালাম সম্পর্কে ইয়াহূদীরা বলেছিলো যে, তিনি ইয়াহূদী ছিলেন এবং খ্রীষ্টানেরা বলেছিলো যে, তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন পুরোপুরি মুসলমান ছিলেন। সুতরাং এ ব্যাপারে আমরা সুপথ প্রদর্শিত হয়েছি। (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা বাকারাহ্‌, পৃষ্ঠা ৫৮৮)

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের সামনে যখন সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণকারী পবিত্র কুরআন উপস্থিত, তাহলে মতবিরোধ কেনো?

উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে যে, মুসলিম জাতিই সুপথ প্রাপ্ত। অতএব কুপথ গ্রহণকারীরা এখন মুসলিমদের বড় শত্রু হিসেবে মাঠে নেমেছে। অর্থাৎ আরবী ভাষাকে অবমূল্যায়ন করার মাধ্যমে ইসলামের বিজয়কে প্রতিরোধ করা ষড়যন্ত্রকারীদের এক বিশাল চক্রান্ত। আজকের পৃথিবীর দিকে নজর দিলে দেখা যাবে যে, সমস্ত বিশ্বজুড়ে আরবী চর্চা প্রায় বিলুপ্তির দিকে। আধুনিকতা, বিশ্বায়ন, বিশ্ব অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে আরবী ভাষার মর্যাদা হারিয়ে যাচ্ছে। রক্ষণশীল উলামায়ে কিরাম নিজের জান বাজী রেখে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

প্রিয় ভাষাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। ফলে জুমুআ'র খুতবায় আরবী ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ।

খুতবা সম্পর্কে লা-মাযহাবীদের ভূমিকা

লা-মাযহাবী শব্দটির সহজ অর্থ যারা মাযহাব বা তাকলীদ মানে না। লা-মাযহাবী দু'প্রকার। **একঃ** যে নিজেই মুজতাহিদ। অর্থাৎ যিনি পবিত্র কুরআন-হাদীসের অর্থ-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিপূর্ণ শরীয়ত সম্মতভাবে পালন করার মতো বিজ্ঞতা রাখেন। **দুইঃ** ইসলামের প্রধান চারটি মাযহাবের কোনোটাই গ্রহণ না করে কুরআন-হাদীস থেকে নিজস্ব বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে মাসআলা আবিষ্কার করে যারা আমল করে, তাদেরকেই **লা-মাযহাবী বলা হয়**। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, লা-মাযহাবীদের প্রকৃত পরিচয় আবিষ্কার করতে গেলে দেখা যায়, ওয়াহাবীয়া, আহলে হাদীস, সালাফীয়া, মওদুদীয়া ইত্যাদি দল ও মতের অনুসারীরা প্রকৃত অর্থে লা-মাযহাবী। কিন্তু দুঃখজনক সত্য যে, তাদের নিজস্ব কোনো ফিকাহ নেই। এমনিতে অসংখ্য অগণিত পুস্তকাদি রচনা করে তারা মুসলিম-অমুসলিম সমাজে বিশাল এক গ্রন্থভাণ্ডার ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সবগুলোই নকল এবং মনোনীত ও গ্রহণযোগ্য ফুকাহায়ে কিরামের কাজকর্মকে চুরি করে তৈরী করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্যের লেখা কিতাবে নিজেদের কিছু মন্তব্য এবং ব্রেনওয়াশ জাতীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে বাজারজাত করা হয়েছে, যাতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ- 'আসান ফেকাহ' নামক গ্রন্থটি লিখেছেন, মাওলানা ইউসূফ ইসলাহী। তিনি শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেবের একজন ভক্ত শিষ্য। **১৯৫৩** বা **১৯৫৪** সালে তিনি জামাত-ই-ইসলামী দলে যোগদান করেন এবং অদ্যাবদি জামাতকর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জনাব মাওলানা ইউসূফ ইসলাহী রচিত এই 'আসান ফেকাহ' গ্রন্থখানি আদ্যপান্ত হানাফী ফিকাহর মাসআলা-মাসাইল দ্বারা লিপিবদ্ধ। ব্যতিক্রম শুধু, যে সকল স্থানে সাধারণ পাঠকের ঈমান ও আকিদা

নড়বড়ে করা যাবে, সেসব স্থানেই ঢুকিয়েছেন ভিন্ন জিনিস। উদাহরণ স্বরূপ- "খুতবার সময় নামায পড়া, কথা বলা, যিকির ও তসবীহতে মুশগুল হওয়া, খানাপিনা করা, সালাম করা, সালামের জবাব দেয়া, এমন কোন কাজ করা যা খুতবা শুনতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তা মাকরূহ তাহরিমী। খুতবার সময়ে কাউকে শরীয়তের হুকুম শিখানো, নেক কাজের উপদেশ দেয়াও নিষিদ্ধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন ইমাম খুতবা দেয় তখন যে কথা বলে তার দৃষ্টান্ত, যে কিতাবের বোঝা বহন করে তার মতো এবং যে ব্যক্তি খুতবার সময় অপরকে বলে, 'চুপ কর,' তার জুমা হলো না।' (মুসনাদে আহমদ, তাবরানী- সূত্রঃ আসান ফেকাহ পৃষ্ঠা ২৯৮) এতে বুঝা গেলো জুমুআ'র খুতবা একটি ইবাদত অর্থাৎ নামায সদৃশ। অথচ শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেব লিখেছেন, 'খুতবার এ বুনিয়াদী উদ্দেশ্য তখনই পূরণ হতে পারে যখন খতীব শ্রোতাদেরকে তাদের নিজস্ব ভাষায় সম্বোধন করবেন যাতে করে শ্রোতাগণ বুঝতে পারেন।" (আসান ফেকাহ পৃষ্ঠা ২৯৮)

একই গ্রন্থে অন্যত্র লেখা হয়েছে, "প্রকাশ থাকে যে, খুতবার জন্যে তাহারাত (পবিত্রতা বা অজু করা) শর্ত নয়। (হেদায়া)" উল্লিখিত ফাতাওয়াটি হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফিকাহ গ্রন্থ আল-হিদায়ার নামে একটি মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। আল-হিদায়া গ্রন্থে (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬) প্রথমেই লিখা হয়েছে, "তাহারাত অবস্থায় দাঁড়িয়ে খুতবা দিবেন।" পরে লেখা হয়েছে, অবশ্য যদি কেউ ভুলে যায়, সেটা ভিন্ন কথা।' কিন্তু এখানে 'আসান ফেকাহ গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৩০১'-এ বলা হয়েছে, 'খুতবার জন্যে তাহারাত শর্ত নয়।' এইভাবে ফিকাহর সিদ্ধান্তসমূহ ইচ্ছেমতো গ্রহণ এবং বর্জন করা হয়েছে।

আল্লাম মওদুদী সাহেব নির্দেশিত আসান ফেকাহ গ্রন্থের অন্যস্থানে বলা হয়েছে, "আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম আহকাম নিজের ইচ্ছেমত ব্যাখ্যা করা, তার অর্থ বিকৃত করে আপন স্বার্থের অনুকূল করা এবং আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধগুলো হুবহু পালন করা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা চরম

মুনাফেকীর কাজ।"

"আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম-আহকামের সমালোচনা করা, তার মধ্যে ত্রুটি বের করা, সময়োপযোগী মনে না করা, এ ধরনের উক্তি করা যে, এসব অন্ধযুগের কাজ-কারবার। এসব কিছুই ভ্রান্ত চিন্তাধারার ফলশ্রুতি যার সাথে ঈমানের কোনই সম্পর্ক নেই।" (আসান ফেকাহ পৃষ্ঠা ৫৯)

পাঠকগণ লক্ষ্য রাখবেন- শরীয়তের সর্বজন স্বীকৃত একটি মাসআলা হচ্ছে মোজার উপর মাসেহ করা। উল্লিখিত 'আসান ফেকাহ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে, "চামড়ার মোজার উপর মাসেহ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত। তবে পশমী, সূতী, রেশমী ও নাইলন মোজার উপর মাসেহ জায়েয হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে কিছু মতভেদ আছে। ফিকাহর কিতাবগুলোতে যে সকল মোজার উপর মুসেহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত চারটি শর্ত পাওয়া যাবে।- ১) এমন মোটা হবে যা কোন কিছু দিয়ে না বাঁধলেও পায়ের উপর লেগে থাকবে। ২) এমন মজবুত হবে যে, তা পায়ে দিয়ে তিন মাইল পায়ে হেটে যাওয়া যাবে। ৩) এতখানি মোটা হবে যে, ভেতর থেকে পায়ের চামড়া দেখা যাবে না। ৪) ওয়াটার প্রুফ হতে হবে যেন উপরে পানি দিলে পানি চুষতে না পারে এবং পানি নীচ পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। যে সব মোজায় এ চারটি শর্ত পাওয়া যাবে না, তার উপর মুসেহ জায়েয হবে না।" (আসান ফেকাহ পৃষ্ঠা ১২৪)

উল্লিখিত মোজার উপর মাসেহ প্রসঙ্গে আল্লাম মওদুদী সাহেব দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার মধ্যে এক পর্যায়ে বলেছেন, "এসব বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শুধু মোজা এবং শুধু জুতা এবং মোজা পরা অবস্থায় জুতার উপর মুসেহ করাও ঐরূপ জায়েয যেমন চামড়ার মোজার উপর। এসব বর্ণনায় কোথাও এমন পাওয়া যায় না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফকীহগণের আরোপিত শর্তগুলোর মধ্যে কোন একটি শর্তের কথা বলেছেন। আর কোথাও এ বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং উপরোক্ত সাহাবীগণ যে মোজার উপর মুসেহ

করেছেন তা কোন্ ধরনের ছিল। এ জন্যে আমি এ কথা বলতে বাধ্য যে, ফকীহগণের আরোপিত শর্তগুলোর কোনই উৎস নেই। যার উপর ভিত্তি করে তারা এসব আরোপ করেছেন। আর ফকীহগণ যেহেতু শরীয়ত প্রণেতা নন, সে জন্যে তাঁদের আরোপিত শর্তের উপর যদি কেউ আমল না করে তাহলে সে গোনাহগার হবে না।" (আসান ফেকাহ পৃষ্ঠা ১২৬, রাসায়েল ও মাসায়েল ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৫৮)

শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেব একটি মাত্র বাক্য দিয়ে ইসলামী শরীয়তের সুবিশাল এই ইমারতটিকে একেবারে ধ্বংস করে ছাড়লেন। হাজার বছর থেকে লক্ষ লক্ষ আলিম-উলামার চিন্তা-গবেষণার ফসল এই ফিকাহশাস্ত্রকে তিনি ভিত্তিহীন মন্তব্য করে, ফাতাওয়া দিচ্ছেন যে, "ফকীহগণ যেহেতু শরীয়ত প্রণেতা নন, সে জন্যে তাঁদের আরোপিত শর্তের উপর যদি কেউ আমল না করে তাহলে সে গোনাহগার হবে না।" অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাবেহের প্রথম তীরই মুমিনের তাহারাত বা পবিত্রতা প্রসঙ্গে। কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেবের এই গবেষণা অধ্যয়ন করে নিজেকে পবিত্র করার লক্ষ্যে শুধু মোজার উপর মাসেহ করে ওযু করে তাহলে তার ইবাদত-বন্দেগী কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে?

ইসলামী ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আবূ যাকারিয়া আন- নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, (জন্ম ৬৩১ হিজরী এবং ইন্তেকাল ৬৭৬ হিজরী) ফিকাহর ইমামদের প্রসঙ্গে লিখেছেন,- "ছাহাবা ও কল্যাণ যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের (সরাসরি) তাকলীদ করা বৈধ নয়। কেননা ইলম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরবর্তী মুজতাহিদগণের তুলনায় তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব সন্দেহাতীত হলেও ফিকাহশাস্ত্রের সংকলন এবং মূলনীতি ও ধারা সুবিন্যস্তকরণের বড় একটা অবকাশ তাঁরা পাননি। এ জন্যই তাঁদের কারো সুবিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ মাযহাব নেই। এ মহান দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী যুগের ইমাম মুজতাহিদগণই আঞ্জাম দিয়েছেন। (নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও মুজাহাদার মাধ্যমে) তারা ছাহাবা তাবেয়ীগণের মাযহাব সংগ্রহ করেছেন। এবং

(কোরআন সুন্নাহর আলোকে) মূলনীতি ও ধারা-উপধারা নির্ধারণপূর্বক সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে ফতোয়া পেশ করেছেন, সেই স্বনামধন্য ইমামগণের অন্যতম হলেন ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।" (ফায়জুল কাদীর, শরহু জামেয়ীস সাগীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ২১০)

একই প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অভিমত হচ্ছে, "কুরআন সুন্নাহর বিচারে ইমাম মুজতাহিদগণের মাঝে ইমাম মালিক ও লাইস বিন সা'আদ, ইমাম আওযায়ী ও সুফিয়ান সাওরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর প্রত্যেকেই স্ব স্ব সময়ের ইমাম ছিলেন। সুতরাং তাকলীদের ক্ষেত্রে এদের মাঝে তারতম্য করার অধিকার কোন মুসলমানের নেই। অবশ্য দু'টি অনিবার্য কারণে বর্তমানে কতিপয় মুজতাহিদের তাকলীদের ব্যাপারে নিষেধ করা হয়ে থাকে।

প্রথমতঃ (নিষেধকারীদের মতে) তাদের মাযহাবের প্রতিনিধিত্বকারী কোন আলিম বিদ্যমান নেই। আর মৃত ব্যক্তির তাকলীদের বৈধতা সম্পর্কে জোরালো মতবিরোধ রয়েছে। এক পক্ষের মতে কোন অবস্থাতেই তা বৈধ নয়। অন্য পক্ষের মতে, মৃত মুজতাহিদের মাযহাব বিশেষজ্ঞ আলিম বর্তমান থাকার শর্তে তা বৈধ। আর চার ইমামই শুধু এ শর্তের মাপকাঠিতে পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারেন।

দ্বিতীয়ঃ (নিষেধকারীগণ বলে থাকেন যে,) বিলুপ্তির শিকার মাযহাবগুলোর প্রতিকূলে ইজমা সম্পন্ন হয়ে গেছে। তবে এ ধরনের ইমাম ও মুজতাহিদের কোন সিদ্ধান্ত জীবন্ত মাযাহাবের অধিকারী মুজতাহিদের সিদ্ধান্তের অনুরূপ হলে তা অবশ্যই সমর্থিত ও শক্তিশালী হয়ে যাবে।" (ফায়জুল কাদীর, শরহু জামেয়ীস সাগীর খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ৪৪৬)

এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'গরিষ্ঠ অংশের অনুসারী হও।' বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য মাযহাবের বিলুপ্তির কারণে এখন চার মাযহাবের অনুসরণই গরিষ্ঠ অংশের অনুসরণ এবং তা লংঘনের অর্থ হলো

গরিষ্ঠ অংশের বিরুদ্ধাচরণ। এ ছাড়া যে কোনো মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত মুতাবিক ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দেয়া হলে উলামায়ে 'সূ' তথা 'ধর্মব্যবসায়ী' আলিমরা নিজেদের ফতোয়াকেও কোন না কোন মুজতাহিদের নামে চালিয়ে দেয়ার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে চার মাযহাবের বেলায় সে আশংকা নেই। কেননা এখানে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের স্বতন্ত্র জামাত গবেষণা ও বিশ্লেষণের ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছেন। সুতরাং তাদের সতর্ক দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে ইমাম চতুষ্টয়ের কোন সিদ্ধান্তেরই ভুল অর্থ করা সম্ভব নয়।" (মাযহাব কি ও কেনো পৃষ্ঠা ৭৭)

অতএব শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেবের গবেষণায় ধরা পড়েছে যে, 'ফকীহগণ শরীয়ত প্রণেতা নন'। অথচ ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অপরাপর ইমামগণের মতে শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেবের মতো গবেষকরা উলামায়ে 'সূ' অর্থাৎ 'ধর্মব্যবসায়ী'। যেহেতু আমরা আগেই বিষয়টি আলোচনা করেছি যে, 'আসান ফেকাহ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের নামে নিজের অপব্যাখ্যা প্রচারকার্যে ধরা পড়েছেন। অন্যদিকে- প্ররম শ্রদ্ধেয় মুজতাহিদ ইমামগণের সমালোচনা করে শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেব নিজেই খারিজী দলভুক্ত হয়েছেন।

আহলে হাদীস ও জুমুআ'র খুতবা

'আহলে হাদীস' দলটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ভিন্ন ভিন্ন উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে ইসলামের প্রাথমিক যুগের পরিভাষার 'আহলে হাদীস'। দ্বিতীয়টি বর্তমান যুগের মডারেট 'আহলে হাদীস'। ইসলামের প্রাথমিক যুগের পরিভাষায় যারা 'আহলে হাদীস' ছিলেন, তারা- হাদীস বর্ণনাকারী, হাদীসের শিক্ষক এবং হাদীস নিয়ে এককভাবে কিংবা সম্মিলিতভাবে চুলচেরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও গবেষণা করতেন। এদেঁর অধিকাংশই ছিলেন- তাবিঈ ও তাবে-

তাবিঈ। উদাহরণস্বরূপ আরবী ভাষায় পান্ডিত্যের অধিকারীদের বলা হতো- আহলে আরব। শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল এবং শরীয়ত বিশ্লেষকদের বলা হতো- আহলে ফিক্বাহ্। কুরআনের তাফসীর বিশারদগণকে বলা হতো- আহলে তাফসীর। ঠিক একই ভাবে হাদীস বিশারদদের বলা হতো- আহলে হাদীস। যেমন ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস গবেষণার একস্থানে আবু ইবরাহীম আনসারী মাদানী সম্পর্কে লিখেন, "আহ্লে হাদীসের মতে সে সবল বর্ণনাকারী নয়।" (তিরমিযী, ২/৪২পৃষ্ঠা) একই ভাবে অপর এক বর্ণনাকারী সম্পর্কেও লিখেছেন, "তাঁর স্মরণ শক্তির ব্যাপারে কোন কোন 'আহলে হাদীস' সন্দেহ পোষণ করেন।" (তিরমিযী, ২/৪২পৃষ্ঠা)

একইভাবে মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও বুখারী শরীফের ভাষ্যকারগণও 'আহলে হাদীস' এবং 'আসহাবুল হাদীস' মূলতঃ হাদীস বর্ণনাকারীদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

মোদ্দাকথা 'আহলে হাদীস' বলতে প্রথম যুগে হাদীস বর্ণনাকারী ও হাদীস বিশারদদের বুঝানো হতো। সে যুগে 'আহলে হাদীস' নামে কোনো পৃথক দল বা গোষ্ঠি ছিলো না। তবে 'সাবাঈ' খারিজীদের পরবর্তী যুগের একটি দলের নাম হচ্ছে 'নাজদাত'। এদের বিশ্বাস বা আক্বিদাহ্ হচ্ছে, "ইমাম ও মাযহাবের কোনো প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র আল্লাহ্র কুরআনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট।" এই দলটি প্রকৃতপক্ষে ফিক্বাহ্'র যুগ বা ইমামদের যুগে জন্ম নিয়েছে। তাদের চিন্তা-গবেষণা ও কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে 'নাজদাত' ফিরকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। (গুনিয়াতুত ত্বালিবীন পৃঃ ২৭৩-২৭৮)

দ্বিতীয় ধারা বা বর্তমান 'আহলে হাদীস' দলটি সুদূর অতীতের 'সাবাঈ' ফিরকার উপদল 'নাজদাত' কি না, ইতিহাসে তা সুস্পষ্ট নয়। তবে অতীতের 'নাজদাত' ও বর্তমান 'আহলে হাদীস' ফিরকা অনেকাংশে অভিন্ন। এমনকি মওদুদী মতবাদের সাথেও তাদের যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমানের 'আহলে হাদীস' দলটির জন্ম ভারত উপমহাদেশে। "মোঘল

সাম্রাজ্য পতনের মধ্যদিয়ে উপমহাদেশের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে পতিত হয় পরাধীনতার অকল্পনীয় জ্বালা। ঘরে ঘরে দেখা দেয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন এক বিশৃংখলাময় ভয়াবহ পরিস্থিতি। নেতা ও নেতৃত্বহীন মানুষের মাঝে আশা-নিরাশার এক ছত্রভঙ্গ পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দেন শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি দেশটিকে 'দারুল হর্‌ব' ফতোয়া দিয়ে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানান। দেশ ও জাতি ঝাপিয়ে পড়ে ধর্মযুদ্ধ বা আজাদী জিহাদে। খন্ড খন্ড যুদ্ধ চলতে থাকে প্রায় শত বছর ব্যাপী। এই যুদ্ধের প্রথম ধাপের সমাপ্তি ঘটে **১৮৩১** খৃষ্টাব্দে, বালাকুটের সাইয়িদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এঁর শাহাদতের মধ্যদিয়ে।" (ইসলামী আক্বীদা ও ফিরাক্বে বাতিলা)

উপমহাদেশীয় জনগণ আবার নেতা ও নেতৃত্বহীন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েন। ঐ সময় ইংরেজদের ডিভাইড এন্ড রোল পলিসির মাধ্যমে মুসলমান সমাজে নতুন নতুন ফিতনা জন্ম নেয়। যেমন কাদিয়ানী ফিতনা, পারভেযী ফিতনা, রেজাখানী বা রেজভী ফিতনা ও আহলে হাদীস ফিতনা ইত্যাদি। মৌলভী আব্দুল হক ব্যানার্জী বা বানারসী নামক একজন আলিম এই 'আহলে হাদীস' ফিতনার জনক। তিনি সাইয়িদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জিহাদী দলে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। সুযোগ পেলে মাঝেমধ্যে মুজাহিদদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতেন। এক বক্তব্যে তিনি বলেন, "মুসলমানদের জন্য মাযহাবের অনুসারী হওয়া জরুরী নয়।" এই বক্তব্য শোনামাত্রই আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে উপদেশ দেন। কিন্ত এতে ফল হয়নি। পরে তিনি তাকে দল থেকে বহিষ্কার করেন। (ইনসাফের নিক্তিতে মিলাদ কিয়াম ও মুনাজাত)

জিহাদী দল থেকে বহিষ্কৃত মৌলভী ব্যানার্জী কখনো- মুহাম্মদী, তাওহীদবাদী, আবার কখনো একত্ববাদী বলে নিজের পরিচয় দিতে শুরু করেন। এ সাথে মাযহাবপন্থীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করেন। নতুন দল গঠনেরও চেষ্টা চালাতে থাকেন।

বালাকুট জিহাদের পরের বছর সাইয়িদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অনুসারীগণ তার অপপ্রচারে অতিষ্ট হয়ে হারামাইনে ফতোয়া তলব করেন। হারামাইন শরীফাইনে অবস্থিত চার মাযহাবের মুফতিগণ একবাক্যে মৌলভী ব্যানার্জীর কর্মকান্ডকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টকারী আখ্যা দেন। ফলে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান এবং আত্মগোপন করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে মৌলভী আব্দুল হক ব্যানার্জী ইরানী বংশধারার লোক। ভারতে অবস্থান নিয়ে তিনি নিজেকে ব্যানার্জী বা বানারসী হিসেবে পরিচিত করেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মৌলভী ব্যানার্জীর শিষ্য মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বেটালভী (কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে তার নাম শায়খ সাইয়্যেদ নাজির হুসাইন) বৃটিশ সরকারের আজ্ঞাবহ নিযুক্ত হন। এই সুযোগে তিনি 'আহলে হাদীস' দলটিকে রাজনীতিমুক্ত ইসলামী সংগঠন হিসেবে রেজিষ্ট্রি করিয়ে নেন। তখন থেকেই তাদের কর্মতৎপরতা বাহ্যিকভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করতে শুরু করে। এদের সম্পর্কে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন মাওলানা মুহাম্মদ শাহ শাহজাহানপুরী লেখেন, "আগে এ ধরণের ধ্যান-ধারণার অধিকারী স্বল্প সংখ্যকের উপস্থিতি কোথাও কোথাও দেখা যেতো। কিন্তু বর্তমানের ন্যায় এতো ব্যাপক ছিলো না। ইদানিং কিছু দিনের মধ্যে তাদের নাম বেশ শোনা যাচ্ছে। তারা যদিও নিজেদেরকে আহলে হাদীস, মুহাম্মদী বা মুওয়াহহিদীন বলে প্রচার করে থাকে, কিন্তু আসলে হক্বের অনুসারীগণ তাদেরকে গায়রে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী, ওয়াহ্হাবী বলেই অভিহিত করে থাকেন। (আল ইরশাদ ইলা সাবীলির রাশাদ ১৩-পৃষ্ঠা)

এ পর্যন্ত 'আহলে হাদীস' ফিরকার অনুসারীদের আকিদা সম্পর্কে যথেষ্ট লেখালেখি প্রকাশিত হয়েছে। উলামায়ে কিরাম এদের আক্বিদা নিয়ে প্রচুর পরিমাণে তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। অধিকাংশ হক্কানী উলামায়ে কেরামের কাছে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, আহলে হাদীসপন্থীরা যখন কোনো বিষয়ের সমাধান খুঁজে পান না, তখন ফিকাহ্র কিতাবের অনুসরণ করেন।

অথচ তারা নিজেকে লা-মাযহাবী বলেন।

যেমন মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী রচিত মাসআলার গ্রন্থ 'আসান ফেকাহ'। গ্রন্থকার নিজে কোন্ মাযহাবের অনুসারী সেটা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ নয়। গ্রন্থখানি অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের এক সময়ের ভারপ্রাপ্ত আমীর মরহুম আব্বাস আলী খান। পুস্তকখানির মুখবন্ধে প্রকাশক লিখেছেন, "উপমহাদেশে সব মতের অনুসারীই রয়েছে। কিন্তু হানাফী মতের অনুসারীদের সংখ্যাই অধিক বিধায় মতপার্থক্য এড়িয়ে শুধুমাত্র হানাফী মতের উপর ভিত্তি করেই এ গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে।" অথচ গ্রন্থখানির অনেক স্থানে হানাফী মাসআলা পেশ করার পর, আহলে হাদীসপন্থীদের নিজস্ব মাসাআলা টীকা অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যে সকল মাসআলা সহজ এবং সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ দানা বাধে, সে সব বিষয়ে টীকা দিয়ে তাদের নিজস্ব মত উল্লেখ করেছেন। অনেকাংশে দেখা গেছে, কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কিছু কিছু মাসআলাকে তারা ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করেছেন। যেমন সফরে বা মুসাফির অবস্থায় কসর নামায সম্পর্কে শরীয়তের সুস্পষ্ট মাসআলা রয়েছে। এ মাসআলায় তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ মতানৈক্যও চোখে পড়ে না। অথচ মাসআলার নিচে টীকা অধ্যায়ে মাওলানা মওদুদী সাহেবের একটি দীর্ঘ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বক্তব্যের শেষাংশে তিনি বলেন, "খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, শরীয়তের ব্যাপারে সে ব্যক্তির মনের ফতোয়াই নির্ভরযোগ্য যে শরীয়ত মেনে চলার ইচ্ছা করে, বাহানা খুঁজে বেড়ায় না- (রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খন্ড পৃঃ ১৬৭ এবং আসান ফিকাহ্ ১ম খণ্ড ২৭৬ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ আল্লামা মওদুদীর এই বক্তব্য থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, (১)- ইমাম ও মুজতাহিদগণের সুদীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত গবেষণার ফসল এইসব মাযহাবগুলো একপ্রকার বাহানা (?)

(২) কেউ যদি তার অপর্যাপ্ত বিদ্যা-বুদ্ধি এবং মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

দিয়ে কুরআন-হাদীস থেকে নতুন শরীয়তের জন্ম দেয় তাহলে সেটাই শরীয়ত (?)

উপরের ঐ বন্ধনীযুক্ত প্রশ্নবোধককে কেন্দ্রকরেই সম্ভবত আজকের সমাজে খারিজীপন্থী বিদআতীদের ধারাবাহিকতা চলমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মরহুম মাওলানা মওদুদী সাহবের উল্লিখিত নতুন নতুন যুক্তিপূর্ণ বিদআত আবিষ্কারের সূত্র হচ্ছে একটি আরবী পত্রিকা। 'ইসলাম শরীআহ্ ও সুন্নাহ্' নামক গ্রন্থখানি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে। ডঃ মুস্তাফা হুস্নী আস্-সুবায়ী রচিত গ্রন্থখানি ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' অনূদিত প্রথম সংস্ককরণ প্রকাশ করে। উক্ত গ্রন্থের ১৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বক্তব্য হচ্ছে, "মরহুম সৈয়দ রশীদ রিযা কর্তৃক সম্পাদিত 'আল-মানার' পত্রিকার নবম বর্ষের ৭ম ও ১২শ সংখ্যায় ডাঃ তাওফীক সিদ্দিকীর দু'টো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাতে প্রকাশ্যে এ শিরোনাম দিয়ে লিখেছেন, 'শুধুমাত্র কুরআনই ইসলাম'। তাঁর সন্দেহগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, 'আমরা কুরআনে কিছুই বাকী রাখি নাই' (সূরা আল-আনআম আয়াত- ৩৮) এছাড়াও 'এবং আমরা তোমার উপর গ্রন্থখানি (কুরআন) নাযিল করলাম সবকিছুর বর্ণনাকারীরূপে।' (সূরা আন-নাহল আয়াত- ৮৯)

উপরোক্ত উভয় আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, দ্বীনের যাবতীয় কিছু কুরআনে আছে। তাঁর যাবতীয় হুকুম তিনি তাতে বর্ণনা করেছেন এবং তাও বিশদরূপে। এরপর সুন্নাত বা অপর কিছুর আবশ্যকতা বাকী থাকে না।" (তথ্যসূত্রঃ ইসলাম শরীআহ্ ও সুন্নাহ্ পৃষ্ঠা- ১৩৮)

দিন-কালের হিসেব করলে দেখা যাবে, ডাঃ তাওফীক সিদ্দিকীর লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে ৪০ এর দশকে। আর জনাব মওদুদী সাহেবের 'তাফহীম' লেখার যুগও ঐ একই সময়ে। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, 'সাহাবাগণের ভূমিকা এবং হাদীস' প্রত্যাখ্যান একটি সুদূর প্রসারী ও নেটওয়ার্ক ভিত্তিক পরিকল্পনা।

আহলে হাদীস সংগঠনের অন্যতম ইমাম আল্লামা ইবনে হাজম জাহেরী এবং ইমাম আল্লামা শওকানী প্রমূখ জুমুআ'র খুতবাকে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করেছেন। (খুতবার ভাষা আহমকাম ও মাসায়েল পৃষ্ঠা ২৪)

উসূলে ফিকাহ্‌র ভাষায় মুস্তাহাব একটি ভালো কাজ। আমল করা ভালো, তবে না করলে কোনো গোনাহ্ বা অন্যায় নয়। আর পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত সত্য যে, খুতবার কারণেই জুমুআ'র নামায ফরয হয়েছে এবং খুতবার ভেতরেও ফরয বিদ্যমান। যেমন- একঃ সময়মতো খুতবা দান ফরয। দুইঃ খুতবার মধ্যে কুরআনের কিয়দংশ তিলাওয়াত করা ফরয। একইভাবে খুতবার উদ্দেশ্যে ও সম্মানার্থে জুমুআ' নামক একটি স্বতন্ত্র সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অথচ আহলে হাদীসপন্থী উক্ত আল্লামাগণের সিদ্ধান্ত পাঠ করে নাউযুবিল্লাহ পড়াই উচিত বলে মনে করি। কারণ 'আহলে হাদীস'-এর মতো পবিত্র শব্দগুলোর অবমাননা করার জন্যেই একদল ইয়াহূদী এই কাজটি করছে বলে আমাদের বিশ্বাস। কারণ ইসলামে যতো ফিরকা বা দলাদলি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে কেবল ইয়াহূদীদেরই প্ররোচনা প্রমাণিত। একথা যেমন ইসলামের ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তেমনি আজকের জগতেও চোখ খুলে তাকালে তা দেখা যায়। আর এদের আসল চক্রান্তই হচ্ছে- পবিত্র কুরআন-হাদীসের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে নড়বড়ে করা এবং মুসলমানদের ঈমান-আমল ধ্বংস করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই সকল মুসিবত থেকে রক্ষা করুন। আমীন।।

যুক্তির নিরিখে খুতবা

প্রথম কথা হলো, ফিকহী বিষয়ে আমরা কোনো যুক্তি দিতে চাই না। দ্বিতীয়তঃ তর্কের খাতিরে তর্ক ও যুক্তির খাতিরে যুক্তি দিয়ে আলোচনা করলেও কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। যেমন, "যদি আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীন ও পরবর্তী যুগের বুজুর্গানে দ্বীনের খুতবাগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে খুতবার কতিপয় ধারাবাহিক উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ১) খুতবায় আল্লাহর প্রসংশা, ২) কলিমায়ে শাহাদাত, ৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদ, ৪) পবিত্র কুরআন থেকে কিয়দংশ তিলাওয়াত, ৫) সৎ কাজের আদেশ এবং ৬) সমগ্র মুসলমানের জন্য দোয়া। আর এ সবই হয় আরবী ভাষায়।" (ইমামুল হিন্দ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত মুছাফফা শরহে মুয়াত্তা।)

উপরোক্ত ছয়টি বিষয় সম্বলিত খুতবা যদি শরীয়তের নির্দেশিত 'প্রকৃত খুতবা' হয়ে থাকে। তাহলে এরকম খুতবা আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় সম্ভব নয়। কারণ আরবী ভাষার উচ্চারণ এতো সুক্ষ্ণ বিষয় যে, আরবী উচ্চারণ ভঙ্গি ছাড়া একই শব্দের অর্থগত পার্থক্য মারাত্মক আকার ধারণ করে। এ বিষয়টি আলিম-উলামা সকলেই জানেন। এই জন্য পবিত্র কুরআনের কিয়দংশ শিক্ষা করা সকল মুসলমানের জন্য ফরয করা হয়েছে। আর জুমুআ'র খুতবায় পবিত্র কুরআন থেকে কিছু তিলাওয়াত করাও ফরয।

আধুনিক যুগে যারা জুমুআর খুতবায় অন্য ভাষা ব্যবহার করার পক্ষপাতি, তাদের যুক্তি হচ্ছে- 'খুতবা' শব্দের অর্থ 'ওয়াজ-নসীহত'। অথচ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা দু'জাহানের বাদশাহ হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশে জুমুআ'র নামাযের আগে যে ওয়াজ-নসীহত দান করেছিলেন, সেই

ইসলামী রাষ্ট্রের অথবা ইসলামী নেতৃত্বের পরিবেশ কি আজকের পৃথিবীতে বিদ্যমান? যেখানে শ্রোতাদেরকে বুঝানোর জন্যে ভিন্ন ভাষার আশ্রয় নিতে হবে? আজকের মুসলিম জাতি কি এরকম ইসলামী আইনে পরিচালিত রাষ্ট্রে বসবাস করেন? খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রবক্তাগণ জুমুআ'র নামাযের আগে যে ওয়াজ-নসীহত করতেন, তা কি আজকের যুগে প্রযোজ্য? আজকের যুগে মুসলমানগণ কি সেই যুগের মতো ইসলামী রাষ্ট্রে জীবন-যাপন করেন? ইতিহাসে বর্ণিত রয়েছে যে, "ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদিনা হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন জুমুআর খুতবা প্রদান কালে হঠাৎ বলে উঠলেন, ইয়া সারীয়াতাহ্ আল-জাবাল, ইয়া সারীয়াতাহ্ আল-জাবাল, ইয়া সারীয়াতাহ্ আল-জাবাল। অর্থাৎ- হে সারীয়াহ্ পাহাড়ে আশ্রয় নাও, হে সারীয়াহ্ পাহাড়ে আশ্রয় নাও, হে সারীয়াহ্ পাহাড়ে আশ্রয় নাও। তিনবার তিনি এই কথাগুলো উচ্চারণ করলেন। তারপর তিনি উপস্থিত জনতার দিকে মুখ ফিরালেন এবং যথারীতি খুতবা দিয়ে নামায শেষ করলেন।" (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৩৮-২৪১)

এটি ছিলো ২৩ হিজরীতে অনুষ্ঠিত সায়্যিদিনা হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু'র এক সেনাপতি হযরত সারীয়া ইবন মুনাইম রাদিয়াল্লাহু আনহু'র যুদ্ধ জয়ের ঘটনা। পরবর্তীতে হযরত সারীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মদীনায় ফিরে আসেন, তখন অনেকেই তাঁকে এই নির্দেশের কথা জিজ্ঞেস করেন। যা তাঁর যুদ্ধ বিজয়েই প্রমাণিত হয়েছে।

উক্ত ঘটনাটি খুতবার ভাষা সংক্রান্ত দলীল না হলেও, খুতবা যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে নির্দেশিত মুমিনের জন্য 'যিকির' (গুরুত্বপূর্ণ ইবদাত) তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর যিকির মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। যিকির মানুষকে দুনিয়ার ক্ষতি ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করে। এই কারণেই খুতবা পাঠ জুমুআ'র নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রধান প্রতিপাদ্য। খুতবা ছাড়া জুমুআ'র নামায শুদ্ধ হয়

না। যেহেতু সায়্যিদিনা হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'খুতবার কারণে জুমুআর নামাযকে চার রাকাআতের স্থলে দু'রাকাত করা হলো।' অন্যদিকে খুতবাদানকারী ব্যক্তিকে হতে হয় খলীফা বা মুমিনদের অভিভাবক। আজকের জগতে কি এরকম কোনো অভিভাবক আছেন? যিনি জুমুআ'র খুতবাদান কালে তাঁর অনুগতকে হাজার মাইল দূরে অবস্থান করেও সাহায্য করবেন তাকওয়া ও পরহেজগারীর মাধ্যমে? আর হযরত সারীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মতো মুমিনগণ আল্লাহর অনুগ্রহে অপ্রত্যাশিত বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন?

এই কারণেই সম্ভবত আল-হিদায়া গ্রন্থে জুমুআ' চালু রাখা সংক্রান্ত বিষয়ে শক্ত নির্দেশ জারী করেছেন। **এক- সমাজে পবিত্র কুরআন প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন। দুই- আল্লাহ এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালন করা উম্মতের জন্যে ফরয। তিন- সমাজে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জুমুআ চালু রাখাও একটি রাষ্ট্রীয় বিধান এবং উম্মতের উপর ফরয। চার- খুতবা দ্বীনি দাওয়াতের অংশ নয়, এটা পবিত্র কুরআনের সূরার মতো সুবিন্যস্ত একটি নির্দেশ বা পরোক্ষ ওহী।** যা আল-হিদায়ার ফাতাওয়াকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত বিষয়গুলোই প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ব্যাখ্যাও ঐ রকম।

অন্যদিকে- পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা না জানলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো।" (সূরা নাহল, আয়াত ৪৩) সহীহ হাদীসে সায়্যিদিনা হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার আনুগত্য স্বীকারকারী হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারকারী এবং যে আমার অবাধ্য হয়েছে সে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়েছে।' সুতরাং এ হলো আলিম ও আমীরগণের আনুগত্য স্বীকারের নির্দেশ। এক আয়াতে

ইরশাদ হচ্ছে- 'তোমরা আল্লাহ তাআলার রাসূলের আনুগত হও' অর্থাৎ তাঁর কিতাবের অনুসারী হও। আল্লাহ তাআলার রাসূলের অনুগত হও' অর্থাৎ তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করো। আর তোমাদের আদেশ দাতাদের আনুগত্য স্বীকার করো। অর্থাৎ তাদের ঐ নির্দেশের প্রতি অনুগত হও যেখানে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য রয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ সৃষ্টি করো, ওর ফায়সালা আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে।' (সূরা-৪২, আয়াত-১০) অতএব, কিতাব ও সুন্নাহ যা নির্দেশ দেবে এবং যে মাসআলার উপর সঠিকতার সাক্ষ্য প্রদান করবে ওটাই সত্য এবং অন্য সবই মিথ্যা।" (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা নিসা তাফসীর)

আমাদের বক্তব্য

আল-হিদায়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, 'শাসক কিংবা শাসক নির্ধারিত লোক ছাড়া অন্য কারো জন্য জুমুআ'র জামআত কায়েম করা জাইয নয়। কেননা জুমুআ বিশাল সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। আর সেখানে ইমাম হওয়া কিংবা অন্যকে ইমাম করা শাসকেরই দায়িত্ব। এছাড়া অন্যান্য কারণে কোন কোন সময় ঝগড়ার সৃষ্টি হয়।' অবশ্য পরবর্তী যুগের উলামায়ে কিরাম উল্লিখিত ফাতাওয়াকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। মূল ফাতাওয়াটির মৌলকিত্ব বজায় রেখে আধুনিকতার সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছেন। কারণ সমস্ত পৃথিবীর কোথাও যেহেতু ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম নেই, সুতরাং জুমুআ'র মতো একটি ফরয নির্দেশকে সাধারণের মধ্যে জীবিত রাখতে হলে একমাত্র 'ইবাদত' হিসেবেই সম্ভব। ফলে জুমুআ'র খুতবাটিও একটি 'ইবাদত' হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

আল-হিদায়া গ্রন্থে লিখা রয়েছে, "জুমুআ'র সালাতের আরেকটি শর্ত হলো খুতবা। কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে

কখনো খুতবা ছাড়া জুমুআ'র সালাত আদায় করেননি।

ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে কেউ যদি যিকির বা খুতবার উদ্দেশ্যে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, অথবা 'সুবহানাল্লাহ' বলে সালাত আদায় করে, তাহলে খুতবা হয়ে যাবে। সায়্যিদিনা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি শুধু 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলার পর তাঁর কথা থেমে গেলো, তিনি মিম্বর থেকে নেমে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। আল-হিদায়া কিতাবের অন্যস্থানে এ-ও রয়েছে যে, জুমুআ'র খুতবা ছোট এবং নামায লম্বা হবে।" (আল-হিদায়া, বঙ্গানুবাদ খণ্ড-১ পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৭)

খুতবা সংক্রান্ত বিষয়ে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ, হাদীসের নির্দেশ, সাহাবায়ে কেরামের আমল, মাসআলা-মাসাইল ও দীর্ঘ আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে এবং উচ্চস্বরে বলা যায় যে, জুমুআ'র খুতবা আরবী ভাষায়ই হতে হবে। যেহেতু হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দান করছিলেন, তখন সামান্য একটি ঘটনা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নাই। সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে আয়াত নাজিল হয়ে যায়। যদিও তখনকার যুগে জুমুআ'র খুতবা ছিলো নামাযের পর। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ আগেও উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে আরো চারটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে- প্রথমতঃ খুতবা যদি আল্লাহর কালামে পাকে বর্ণিত 'যিকির' হিসেবে চিহ্নিত না হতো, তাহলে খুতবা পাঠ করার ও শোনার উপর এতো শক্ত নির্দেশ জারী হতো না। "যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে হুজুরে আকারাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শপথ সেই আল্লাহ পাকের যাঁর হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাণ রয়েছে, যদি খুতবার সময় তোমাদের কেউ না থাকতো, তবে এই এলাকা অগ্নি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যেতো, আর তোমাদের সকলকে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলতো।" (তাফসীরে নূরুল কুরআন, খণ্ড-২৮, পৃষ্ঠা ২১৫) এতে বুঝা যায় খুতবা

জুমুআ'র নামায সদৃশ ইবাদত, তাই আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষায় এই খুতবাদান মাকরূহ তাহরিমী।

দ্বিতীয়তঃ জুমুআ'র ফরয নামাযের সাথে যদি খুতবার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না হতো, তাহলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআ'র খুতবার সময় পরিবর্তনের নির্দেশ দিতেন না। যদিও সূরা জুমুআ'র **১১** নম্বর আয়াত নাজিলের সময় জুমুআ'র খুতবা দেওয়া হতো নামাযের পরে। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, খুতবা জুমুআ'র ফরয নামায সদৃশ ইবাদত, তাই আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষায় এই খুতবাদান মাকরূহ তাহরিমী।

তৃতীয়তঃ হাদীসে সাহাবী। উসূলে ফিকাহ্র ভাষায় সাহাবায়ে কেরামের কোনো বাণী বা আমলও শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। অতএব সায়্যিদিনা হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ভাষায়, 'খুতবার কারণে জুমুআর নামাযকে চার রাকাআতের স্থলে দু'রাকাত করা হলো।' এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, জুমুআ'র খুতবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুতবার ভেতরে যেহেতু ফরয (পবিত্র কুরআন থেকে কিয়দংশ) তিলাওয়াত রয়েছে, তাই জুমুআ'র খুতবাও নামায সদৃশ ইবাদত। তাই আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষায় এই খুতবাদান মাকরূহ তাহরিমী।

চতুর্থতঃ হাদীস শরীফে (হাদীসটি অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে) বর্ণিত হয়েছে, 'ইমাম যখন খুতবার জন্য বের হয়ে আসেন, তখন কোনো নামায নেই, কোনো কথাও নেই।' এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, খুতবা নামায সদৃশ ইবাদত। সুতরাং ইবাদত আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় মাকরূহ তাহরিমী।

অতএব আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে 'সুবিন্যস্ত একটি নির্দেশ বা পরোক্ষ ওহী'র নির্দেশ পালন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।।

ইসলামের প্রথম জুমুআ'র খুতবার বঙ্গানুবাদ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন তাঁর উটনী কাসওয়ায় চড়ে পবিত্র শহর কুবা থেকে রওনা হলেন, সে দিনটি ছিলো জুমুআ'র দিন। বনূ সালিম ইবন আওফের গোত্রে পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে যায়। তাই সেখানেই তিনি মুসলমানদেরকে নিয়ে জুমুআ'র নামায আদায় করেন। আর এটা ছিলো রানুওয়ানা উপত্যকায়। এটা ছিলো মদীনায় মুসলমানদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম জুমুআ'র নামায অথবা এটি ছিলো মুসলমানদের প্রথম জুমুআ'র নামায। আল্লাহই ভালো জানেন। কারণ, মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের পক্ষে সকলে একত্র হয়ে জুমুআ'র নামায আদায় করা, তাতে খুতবা বা ভাষণ দান করা, ঘোষণা বা আযান দেয়া এবং সমাবেশে ভাষণ দেয়া সমম্ভব ছিলো না। কারণ, সময়টা ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মুশরিকদের প্রচণ্ড বিরোধিতা আর নির্যাতন নিপীড়নের।

ইবন জাবী (রাবী) ইউনুস ইবন আবদুল আলা সূত্রে আবদুর রহমান আল জামাহীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, মদীনায় বনূ সালিম আমর ইবন আওফ-এর মহল্লায় (উপত্যকায়) প্রথম জুমুআর নামাযে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে খুতবা দান করেন, তা ছিলো নিম্নরূপ-
"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমি তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাইছি, তাঁর নিকট মাগফিরাত তথা ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং তাঁর কাছে হিদায়াত কামনা করছি। আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, তাঁর প্রতি কুফরী করি না, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে আমি তার সঙ্গে দুশমনী করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত, নূর আর সত্য দ্বীন সহকারে

উপদেশ নিয়ে রাসূলের আগমনে বিরতির পর। আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন জ্ঞানের স্বল্পতা, মানুষের গোমরাহী, সময়ের ব্যবধান কিয়ামতের নৈকট্য আর মৃত্যু ঘনিয়ে আসার পর। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চিত সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে, সেতো নিশ্চিত বিপদগামী হয়, স্থানচ্যুত হয় এবং গোমরাহীর অতল তলে নিমজ্জিত হয়।

আমি তোমাদের ওসীয়ত করছি আল্লাহকে ভয় করে চলবে। কারণ, একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে যে বিষয়ে ওসীয়ত করতে পারে, তন্মধ্যে তাকওয়া হলো সর্বোত্তম। একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে আখিরাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে, আল্লাহকে ভয় করে চলার হুকুম করবে। সুতরাং আল্লাহ তোমাদেরকে নিজেদের ব্যাপারে যে সতর্ক করেছেন, তোমরা সে ব্যাপারে সতর্ক হও। এর চেয়ে উত্তম কোনো নসীহত নেই, নেই এর চেয়ে উত্তম কোনো উপদেশ। আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে কাজ করাই হলো তাকওয়া। পরকালের ব্যাপারে তোমরা যে সহায়তা-সহযোগিতা তালাশ করতে পারো তা হলো এ তাকওয়া। যে ব্যক্তি তার নিজের এবং আল্লাহর মধ্যকার গোপন এবং প্রকাশ্য বিষয় সংশোধন করে নিয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে কার্য সম্পাদন করে এবং এ ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তোষ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করে না, তার পরিমাণ তার মৃত্যু পরবর্তী জীবনে হবে তার জন্য যিকর ও সঞ্চয় স্বরূপ। যখন মানুষ যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তার মুখাপেক্ষী হবে, হবে সে জন্য কাঙ্গাল। আর যে কাজ হবে এর বিপরীত, সে জন্য সে ব্যক্তি কামনা করবে যে, যদি তার এবং সে কর্মের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান সৃষ্টি হতো। আল্লাহ তোমাদেরকে হুশিয়ার করেছেন তাঁর নিজের ব্যাপারে। আর বান্দাদের প্রতি আল্লাহ অতিশয় দয়ালু। আর আল্লাহ তাঁর বাণী সত্য করে দেখান, পূরণ করেন তাঁর ওয়াদা-অঙ্গীকার। এর কোনো খেলাফ তিনি করেন না, করেন না ব্যতিক্রম। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার কথার কোনো রদ-বদল হয় না, কোনো হেরফের

হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি অবিচার করি না।' (সূরা ৫০ ঃ ২৯)

ইহকাল আর পরকালের সকল ক্ষেত্রে গোপন আর প্রকাশ্যে কেবল আল্লাহকেই ভয় করে চলবে। কারণ, আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার পাপরাশি মোচন করবেন এবং তাকে দেবেন মহা পুরস্কার।' (সূরা ৬৫ ঃ ৫) মহান আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'আর যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলে আনুগত্য করবে, তারা মহাসাফল্য অর্জন করবে। (সূরা ৩৩ ঃ ৭১)

কারণ আল্লাহর ভয় তাঁর ক্রোধ থেকে রক্ষা করে, তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করে, রক্ষা করে আল্লাহর বিরাগ ভাজন হওয়া থেকে। আর আল্লাহর ভয় চেহারাকে উজ্জ্বল করে, পালনকর্তার সন্তুষ্টি আকর্ষণ করে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে। তোমরা নিজেদের অংশ গ্রহণ করো এবং আল্লাহর প্রতি কর্তব্যে শৈথিল্য করো না। কেননা, আল্লাহ তো তোমাদেরকে তাঁর কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন, তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর পথ, যাতে করে তিনি (প্রকাশ্যে) জানতে পারেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী। সুতরাং অন্যদের প্রতি তোমরা অনুগ্রহ করো, যেমনটি আল্লাহ তোমাদের প্রতি করেছেন। আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে তোমরাও দুশমনী করো। তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং তোমাদের মুসলিম নামকরণ করেছেন। যাতে যারা ধ্বংস হওয়ার তারা যেনো সত্যাসত্য স্পষ্ট হওয়ার পর ধ্বংস হয়, আর যাদের বেঁচে থাকার, তারা যেনো সত্যাসত্য স্পষ্ট হওয়ার পর বেঁচে থাকে। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (কিছু করার) কোনো শক্তি নেই। তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করবে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করবে। কারণ, কেউ তার এবং আল্লাহর মাধ্যের সম্পর্ক সুন্দর আর সংশোধন করলে তার এবং মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হবে। আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ মানুষের বিচার-ফায়সালা করেন, মানুষ আল্লাহর বিচার করতে পারে না। আল্লাহ মানুষের

মালিক, মানুষের কোনো আধিপত্য নেই। আল্লাহু আকবার- আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া বঙ্গানুবাদ- ৩য় খণ্ড, ৩৭৯ - ৩৮২)

তথ্যসূত্রঃ-

১. খুতবার ভাষা আহকাম ও মাছায়েল, পুস্তিকাখানি রচনা করেছেন দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র, জামিয়া ইসলামিয়া আজীজুল উলূম বাবুনগর চট্টগ্রাম-এর মুহাদ্দিস হাফিজ মাওলানা মুহাম্মাদ জুনায়েদ। শায়খুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা হযরত মাওলানা মুফতী আহমদুল হক সাহেবের অভিমত ও সত্যায়নসহ ইসলামী গবেষণা পরিষদ, জামিয়া ইসলামিয়া আজীজুল উলূম বাবুনগর মাদরাসার তত্ত্বাবধানে পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হয়েছে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১।

২. বঙ্গানুবাদ বেহেশতী জেওর, মূলঃ হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। অনুবাদঃ হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, প্রাক্তন শায়েখ জামেয়া কুরআনীয়া লালাবাগ, ঢাকা। প্রকাশকাল- চতুর্থ মুদ্রণ ১৮ মে ১৯৭৩।

৩. বঙ্গানুবাদ খুতবাতুল আহমকাম, মূলঃ হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস এম.এ. প্রকাশক এমদাদিয়া লাইব্রেরী। প্রকাশকাল অষ্টম মুদ্রণ ১৯৯৬।

৪. এহইয়াউ উলূমিদ্দীন মূল হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, বঙ্গানুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

৫. আল-হিদায়া, বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবূ বকর আল-ফারাগানী আল-মারগীনানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, অনুবাদঃ মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ, প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৮।

৬. হুকূকুল মোস্তফা (সাঃ) (উম্মতের উপর প্রিয় নবীজীর হক) মূলঃ ফকীহুল উম্মত হযরত মাওলানা মুফতী মাহ্মুদ হাসান গাঙ্গুহী (রহঃ) মুফতীয়ে আযম ভারত, ছদর মুফতী- দারুল উলূম দেওবন্দ। অনুবাদঃ মুফতী মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ

৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত আল-হিদায়া বঙ্গানুবাদ

৯. ইসলামী আক্বীদা ও ফিরাক্বে বাতিলা

১০. ইনসাফের নিক্তিতে মিলাদ কিয়াম ও মুনাজাত

১১. গুনিয়াতুত ত্বালিবীন

১২. মাযহাব কি ও কেনো

১৩. আল ইরশাদ ইলা সাবীলির রাশাদ

১৪. আসান ফেকাহ পৃষ্ঠা ১২৬, রাসায়েল ও মাসায়েল

১৫. খুতবাতুল ইয়াকুবিয়া- ছাহেব কিবলাহ্ আল্লামা আবদুল লতীফ চৌধুরী ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি